বাংলাপিডিএফ

পি. সি. সরকারের

যাদু বিদ্যা ম্যাজিক শিক্ষা

পি. সি. সরকারের

যাদু বিদ্যা ম্যাজিক শিক্ষা

যাদুকর

পি. সি. সরকার

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২, বাংলা বাজার
ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৮ ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২, খ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রনেঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

।। পর্দার ওপাশে ।।

ম্যাজিকের জগতে পরিষ্কার দুটো ভাগ আছে। ভাগটা পর্দার এপাশের আর ওপাশের। পর্দার ওপাশে থাকেন দর্শকরা, আর এপাশে থাকি আমরা, শিল্পীরা। পর্দার ওপাশের লোককে আমরা কখনও এপাশে ঢুকতে দিই না। বরঞ্চ তাঁদের কাছ থেকে সবকিছু রেখে-ঢেকে আড়ালে গোপন করে রাখি। অনুষ্ঠানে যতটুকু দেখাবার, ঠিক ততটুকুই দেখাই, কিন্তু তার বাইরে অতিরিক্ত ছিটে-ফোঁটা বেশি কিছু দেখানো তো দূরের কথা, খোলাখুলিভাবে আলোচনাও করতে চাই না। দর্শকরা এখানে ঢুকে গেলে বা এখানকার আসল খবরাখবর ঠিক ঠিক মতো পেয়ে গেলে রহস্যের অনেক কিছুই ফাঁস হয়ে যাবে। তাঁরা বুঝে ফেলবেন কোন ম্যাজিকটা কিভাবে হয়। কোথায় গোপন জিনিস লুকোন থাকে ইত্যাদি। আর অসম্ভবগুলো আসলে সব নকল। সেজন্যেই পর্দার এপাশে আমাদের এই জগতের সবকিছুই এত গোপন করে রাখা ঢাকা দেওয়া, পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে, কারুর এদিকে উঁকি মারাও নিষেধ।

এই বই-এ আমি আমাদের এই গোপন জগতের অনেক রহস্যই তোমাদের কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছি। কিছু কিছু ম্যাজিকের কৌশল শিখিয়ে সেটা কিভাবে হয়, কিভাবে দেখালে আরও জমে যায়-সবকিছুই জানাবার চেষ্টা করেছি। কোন্ পরিবেশে আমি কোন্ ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলাম—সে গল্পও বলেছি। যাতে তোমরা ম্যাজিকগুলোর 'মেজাজ' এবং 'গভীরতা' ঠিকমতো বুঝে নিতে পারো। সব ম্যাজিকই তো আর সমান মেজাজের নয়। তাদের গাম্ভীর্য, গভীরতাও আলাদা আলাদা। মনে করো, কারুর জন্মদিনে যদি কোনও জাদুকর তার সহকারীর জিব কেটে জোড়া লাগাবার রক্তারক্তির খেলা দেখান, তাহলে কি আর সেটা সঠিক জায়গায় সঠিক মেজাজের জাদু দেখান হল? মোটেই না। বরঞ্চ সেখানে যদি হাওয়া থেকে কিছু উপহার আবির্ভাব করে দেখানো হতো তাহলে সেই পরিবেশে খেলাটা খুব মানানসই হয়ে সবাইকে আনন্দ দিত। এ কারণেই আমি শুধুমাত্র কৌশলটা না শিখিয়ে তার সাথে পরিবেশটাকেও বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি। ম্যাজিকের সাফল্য তো শুধুমাত্র কৌশলের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে আরও অনেক কিছুরই ওপর। 'পরিবেশ'

হচ্ছে তার মধ্যে একটা খুবই দরকারী অঙ্গ। সাফল্যের অনেকটা নির্ভর করছে এর ওপর। আর তারপরেই আসছে ঐ পরিবেশের সঙ্গে মানানসই 'পরিবেশন পদ্ধতি' বা কিভাবে সেটা দেখানো হলো সেই জিনিসটা। কি দেখাচ্ছো সেটা নিশ্চয়ই খুব দরকারী। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকারী হচ্ছে কিভাবে দেখাচ্ছি সেটা। এই 'কিভাবে দেখাবে' আবার তোমার ব্যক্তিত্ব বা পারসোনালিটি, কাকে দেখাচ্ছ তাদের রুচি, বুদ্ধিমত্তা এবং কোন্ পরিবেশে দেখাচ্ছ তার অনুকূলতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। সেগুলো এক একটা বিরাট আলোচনার বিষয়। তবে সংক্ষেপে সহজে বুঝাবার জন্য আমি কৌশলের সঙ্গে প্রতিটিতেই কাকে দেখিয়েছিলাম, কখন দেখিয়েছিলাম, কিভাবে দেখিয়েছিলাম ইত্যাদি গল্প করে লিখেছি। তোমরা ঠিক বুঝে নিতে পারবে।

অনেক ম্যাজিকের কৌশলই আমি নানা পত্র-পত্রিকায়, বইতে প্রকাশ করে থাকি। তোমরা হয়ত ভাবো— তাহলে তো সবাই সবকিছু জেনে ফেলে। কাউকে আর এ ম্যাজিক দেখিয়ে চমকানো যাবে না। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। হিসেব করে দেখা গেছে এতে জাদুজগতের কিচ্ছু ক্ষতি হয় না— বরঞ্চ উন্নতি হয়। কৌশলটা আড়ালে করতে তোমাদেরকে এখেলাগুলো আরও সযত্নে সুচিন্তিতভাবে— আরও বুদ্ধি, মেহনত খাটিয়ে দেখাবার চেষ্টা করতে হবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাজিকটা আরও একধাপ সুন্দর হয়ে এগিয়ে যাবে। বাকি সবাই তো আর তোমার চিন্তার খবর জানেন না— সুতরাং তারা তোমার এই নতুন ভঙ্গীমায় দেখানোতে আরও বেশি চমক, আনন্দ আর মজা পাবেন। সে মজার সাফল্যেই কৌশল হয়ে যাবে গৌণ এবং শিল্পী হিসেবে তোমাদের সম্মান আরও বাড়বে। তাতে নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকে আরো খুশি হবে।

ম্যাজিককে নিছক হাত-সাফাই-এর জগতে বন্দি না রেখে তার উপস্থাপনার আর্টকে আরও বিকাশ করাবার সুযোগ দিলে দর্শকরা জাদুর মজা আরও বেশি উপভোগ করেন। ঘটনাটা বুঝতে অন্য আর একটা শিল্প, এই যেমন-'গান গাওয়ার' সঙ্গেই তুলনা করে দেখা যাক। একটা গানের কথা আর স্বরলিপি জানা থাকলে কি গানটার সবকিছু আস্বাদন করা হয়ে যায়? মোটেই না। সুগায়কের গলায় সে গান শুনলে তবেই তো তার সত্যিকারের চেহারাটা ফুটে উঠে। তারপরে কিন্তু সে গানটা আবার বেশ কয়েকবার শুনে তার কথা এবং সুর মনে গেঁথে গেলেও তা পুরোন হয় না।

ভাল গান কি আমরা মুগ্ধ হয়ে বারবার শুনি না? সবই নির্ভর করছে ভালভাবে গাওয়ার ওপর। তারপরে নতুন কোন গায়ক যদি আবার তাঁর নতুন গলায় ঐ গানটাই আবার নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়ে পরিবেশন করেন তখন আমরা তার গলার কাজ ভাল হলে, নতুন করে তাকেও তারিফ করি। পুরনো গান চিরনতুন হয়ে থাকে। ম্যাজিকের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। জাদুবিদ্যা হচ্ছে বুদ্ধি খাটানোর এক আর্ট। সেজন্যে শিখলেই যে সবাই বুঝতে পারবে বা সেটা করে দেখাতে পারবে তা কিন্তু মোটেই নয়। যাদের বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি যারা সঠিকভাবে সঠিক ঢঙে খাটাতে পারে— ম্যাজিক শুধু তাদের হাতেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারো·····অন্যেরা অর্থাৎ যাদের হাতে এ শিল্প বিকশিত হওয়া নয় তাদের হাতে জাদুর লাঠি কিছুক্ষণের জন্য উঠলেও–দর্শকরা তাকে এক বেমানান, অদক্ষ, হিজিবিজি শিল্পী হিসেবে বাতিল করে দেবেন। এটাই হয়ে আসছে। এটাই নিয়ম। জাদুকরদের নিয়ে তোমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভালভাবে রপ্ত করে, নিজের মতো করে দেখিয়ে যাও, দেখবে সবাই তোমার তারিফ করছেন।

এ বই-এর মাধ্যমে আমি তোমাদের পর্দার ওপাশ থেকে এপাশে আনছি। তাই বলেছি, সাধারণ দর্শকের এ জগতে আসা একদম নিষেধ। সেজন্য মাঝখানের পর্দাটা পুরো খুলে হাট করছি না। শুধু একটু ফাঁক করে তোমাকে আর তোমার মতো আর কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত বিশেষ উৎসাহী শিক্ষার্থীকে ভেতরের জগতে আনছি। তাছাড়া এ বই তো আমি বেশি ছাপতে দিইনি— সুতরাং বেশি লোকের হাতে যাবে কিভাবে? তোমরা হয়তো ভাবতে পারো—হঠাৎ তোমাদের এ সুযোগ দিলাম কেন? কারণটা কি জানো? কারণটা হলো তোমাদের মতো উৎসাহী এবং বুদ্ধিদীপ্ত নতুন যুগের নতুন প্রতিভাদের, জাদুর এ জগতে আসার ভীষণ প্রয়োজন। 'ম্যাজিক'কে আরও উন্নত করতে হলে নতুন নতুন প্রতিভার ছোঁয়া চাই। তোমাদের মধ্যেই সে 'প্রতিভা' লুকিয়ে আছে। আর সেজন্যেই আমি আনন্দের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে আমার ইন্দ্রজালের গোপন জগতে। এ বই তো সবে প্রথম ধাপ। এরপর আরও অনেক কঠিন কঠিন ম্যাজিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। দেখবে তোমাদের খু-ব ভাল লাগবে।

ইতি–

জাদুকর পি. সি. সরকার

লোডশেডিং ম্যাজিক

ম্যাজিকটার নাম শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ। ভাবছ এটা নিশ্চয়ই একটা বিরক্তির ম্যাজিক। কারণ, লোডশেডিং জিনিসটাই জঘন্য রকম, তার ম্যাজিক তো বাজে হবেই। তাই না? ঠিক কথা। লোডশেডিং আমারও ভাল লাগে না। বিশেষ করে ম্যাজিকের মধ্যখানে হঠাৎ ঘ্যাচাং করে লোডশেডিং হয়ে গেলে আরও খারাপ লাগে। কিন্তু তবুও দাঁতে দাঁত চেপে মেনে নিতে হয়। এছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে। এখন তো লোডশেডিং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অঙ্গ। বরং একদিন লোডশেডিং না হলেই কেমন যেন—কি যেন হয়নি, কি যেন হয়নি বলে মনে হয়। সে যাই হোক, লোডশেডিং-এর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের আরও অনেকদিন চলতে হবে ভেবে আমার ম্যাজিকের দুনিয়াতেও লোডশেডিংকে এক সামাজিক ম্যাজিক হিসেবে স্থান দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, আজকের এ ম্যাজিকটার নাম লোডশেডিং হলেও এটা কিন্তু লোডশেডিংয়ের ম্যাজিক নয়। আসলে লোডশেডিংয়ের মধ্যে এ খেলাটা আমায় দেখাতে হয়েছিল বলেই এর নাম দিয়েছি আমি লোডশেডিং ম্যাজিক।

এ কয়েকদিন আগে আমার কয়েকজন বন্ধু এসে ধরেছিল ম্যাজিক দেখাবার জন্য। ওদের খুশি করতে এক প্যাকেট তাস বের করে যেই না ম্যাজিকটা শুরু করতে যাব, এমন সময় সেই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটে গেল। ঘচাং করে হয়ে গেল লোডশেডিং। ম্যাজিক তো দেখার জিনিস—লাইট না জ্বললে লোকে দেখবেন কি করে? আর এমনই দুর্ভাগ্য, হাতের কাছে একটাও মোমবাতি খুঁজে পেলাম না। অন্ধকারের মধ্যে একজন ফশ করে বলে উঠল, "প্রদীপদা আপনি তো কতরকম ম্যাজিক দেখান, তা এ অন্ধকারেই একটা ম্যাজিক দেখান না।" আমি হেসে বললাম, "দেখাতে পারি, কিন্তু; তোমরা দেখতে পাবে তো?" বাঁ পাশ থেকে একজন আবার বলে উঠল, "এমন ম্যাজিক দেখান যেটা না দেখেও বুঝা যায়।"

ভাল বলেছে কথাটা। সবাই আমায় চেপে ধরল ওই ধরনের একটা ম্যাজিক করবার জন্য। আর আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। এ অন্ধকারে কি

করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললাম, "ভূতের ম্যাজিক দেখবে?" সবাই তো মহাখুশি। "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূতের ম্যাজিক হোক"—একসাথে সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠল; আর তার সাথেই একটু ঘেঁষে এসে বসল আমার কাছে।

আমি বললাম, "দ্যাখো এ ম্যাজিকটা মোটেই ভয়ের কিছু নয়। কারণ ভূতটা খুব নিরীহ, আর শুধু তা নয়, ও এতই ভিতু যে, তোমাদের ভয়ে এখানে নাও আসতে পারে। তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, ওকে মারবে না বা বকবে না, তাহলে কিন্তু আমি কে এখানে এনে মজার মজার কাজ করাতে পারি।"

ভিতু ভূতের কথা শুনে বন্ধুরা তো খুব খুশি। আমি বললাম "তোমাদের কেউ যদি ভুল করে মেরে বসো, বা ওকে হাত দিয়ে ধরতে যাও, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল হবে না। তার থেকে একটা কাজ করা যাক, আমরা সবাই একজন অন্যজনের হাত ধরাধরি করে বসে থাকি, তাহলে অনেক নিশ্চিত হওয়া যায়। কেউ কিন্তু কারোর হাত ছেড়ো না, শক্ত করে ধরে থেকো। এই যেমন ধরো আমার ডাইনে যে আছ, সে তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরো, আর ডান হাত দিয়ে ওপাশের ছেলেটার বাঁ হাত ধর। আমি আমার বাঁ হাত দিয়ে আমার বাঁ পাশে বসা বন্ধুর ডান হাতটা ধরছি এবং সে যেন তার বাঁ হাত দিয়ে তার পাশের জনের ডান হাতটা ধরে। এভাবে সবাই মিলে ডান হাত-বাঁ হাত ধরাধরি করে শেকলের মতো বসে থাকি। সবাই শক্ত করে হাত ধরে থাকবে, কেউ কারোর হাত ছাড়বে না, সবার হাত যেন ধরা থাকে।"

ব্যাপারটা সবাইকে বুঝিয়ে আমরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে বসে পড়লাম। সবাই শক্ত করে একে অন্যের হাত ধরে আছে। আমি তখন গম্ভীর গলায় বলতে লাগলাম, "শান্ত ভূত চলে এসো, আমরা হাত ধরে বসে আছি। তুমি এসে আমায় বুঝিয়ে দাও যে, তুমি এখানে এসেছ।"

এভাবে কয়েকবার বলতেই শুরু হল অদ্ভুত সমস্ত কাণ্ডকারখানা। আমাদের সবার মাঝখানে রাখা ছিল একটা কাচের গ্লাস, কিছু কাগজ, কলম আর পেন্সিল। পেন্সিলটা হঠাৎ গ্লাসের গায়ে ঠকাঠক ঠকাঠক করে আওয়াজ করতে শুরু করল। আমরা কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে

পরিষ্কার বুঝতে পারছি কে যেন পেন্সিলটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আওয়াজ করছে। আর শুধু তা নয়, কাগজটা তুলে সবার গায়ে আলতো করে ছুঁইয়ে আবার স্বস্থানে রেখে দিল। বলা বাহুল্য, আমরা কেউই কিছু করছি না, কারণ সবারই তো হাতগুলো শক্ত করে ধরা। সবাই অবাক হওয়ার চেয়ে ভয় পেয়েছিল বেশি।

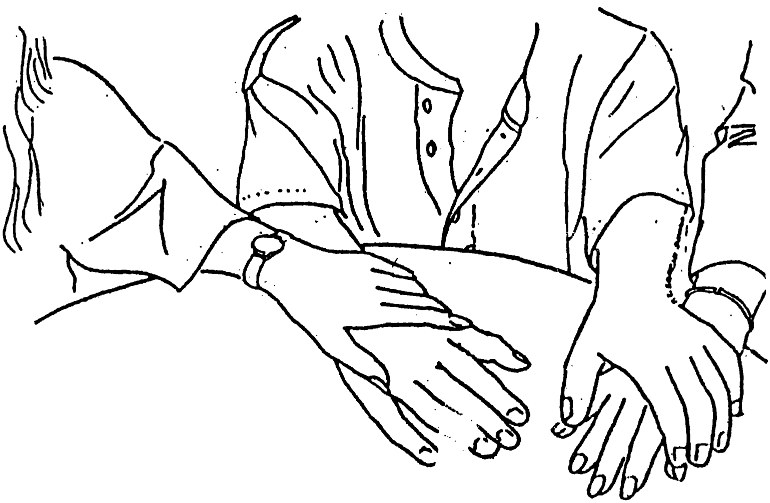

সবাই ভাবছে, আমার হাত দুটো এভাবে ধরা আছে

তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ, ভাবছ এটা কি করে সম্ভব? ভূতটুত তো বাজে কথা, কিন্তু তাহলে ওগুলো হচ্ছিল কিভাবে? আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ সহজ। পুরো কাজটা আমিই করছিলাম। পাশাপাশি একজন অন্যজনের হাত ধরা থাকলেও আমার বাঁ হাতটা কিন্তু মোটেই ধরা ছিল না। আমার ডান দিকের জন তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতের কব্জির

একটু ওপরটা শক্ত করে ধরেছিল। আর আমি বাঁ হাত দিয়ে আমার বাঁ দিকের লোকের ডান হাতটা ধরবার নাম করে আসলে আমার ডান হাত দিয়েই ধরেছিলাম। আমার ডান হাতটাই শুধু বন্দী ছিল, বাঁ হাত ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং ঐ ভৌতিক কাজকর্মগুলো করতে আমার মোটেই অসুবিধা হয়নি। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারবে।

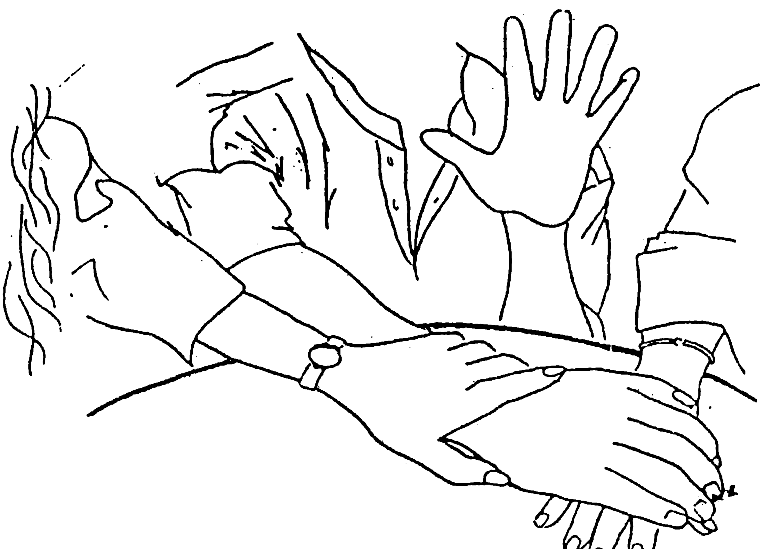

সবাই ভাবছে, আমার দুহাতই ধরা আছে। আসলে আমার বাঁ হাত মুক্ত

লোডশেডিংয়ের মধ্যে, ম্যাজিকটা করে দেখো, দেখবে সত্যি সত্যিই ভূতুড়ে ব্যাপার বলে সবাই ভাবছে! হ্যাঁ, আর একটা কথা, এটা বন্ধ ঘরে দেখানো উচিত। নইলে সবাই ভাববে বাইরে থেকে কেউ এসে ঐসব কাণ্ডকারখানা করছে। তাতে পুরো মজাটাই মাটি হয়ে যাবে।

ভবিষ্যৎ বাণী

তোমরা প্রত্যেকেই জানো, ঠিকমত অভ্যাস করা না থাকলে ম্যাজিক দেখানো মুশকিল। কারণ ম্যাজিকের মধ্যে কৌশলটাই বড় কথা নয়, তার থেকে আরও দরকারী জিনিস হচ্ছে তার উপস্থাপন পদ্ধতি। ঠিকমতো দেখাতে না পারলে ম্যাজিকের কৌশলটা যতই সুন্দর হোক না কেন, কিছুতেই জমবে না। কিন্তু লেখাপড়া, খেলাধুলো ইত্যাদি নানা কাজের মাঝখানে ম্যাজিকের অভ্যাস করতে অনেকেই তোমরা সময় পাও না বলে জানিয়েছ। সেজন্য ঠিক করেছি খুব কম অভ্যাসে দেখানো যায়, এমন ম্যাজিকই তোমাদের আমি এ বই-এ শেখাবো।

এ ম্যাজিকটা আসলে দুটো ম্যাজিকের সংমিশ্রণ। দুটোকে আলাদা আলাদা করে দেখানো যায়, কিন্তু একসঙ্গে মিশিয়ে দেখালে খুব চমৎকার হয়। তোমরা ইচ্ছে করলে এগুলো আবার অন্য ম্যাজিকের সঙ্গেও মিশিয়ে দেখাতে পারো। আগে বলেছি, আবার বলছি, সব কিছু নির্ভর করছে কি দেখাচ্ছ এবং কিভাবে দেখাচ্ছ তার ওপর। যাই হোক, প্রথম থেকেই শুরু করছি।

জাদুকর দর্শকদের সামনে একটা কাগজের মধ্যে ছকে লেখা কতগুলো নম্বর দেখিয়ে বললেন—এ ছকে মোট ষোলটা খোপ আছে। লম্বালম্বিভাবে চারটে খোপ আর পাশাপাশিভাবেও চারটে খোপ এতে রয়েছে। এ খোপগুলোর প্রত্যেকটাতেই কিছু কিছু নম্বর লেখা আছে। আবার তিনি একজন দর্শককে বললেন, ঐ ছকের লম্বালম্বি অথবা পাশাপাশি অথবা কোণাকুণি খোপের যে কোনও একটা লাইন পছন্দ করতে এবং সে লাইনের চারটে খোপের সবকটা নম্বর অন্য একটা কাগজের টুকে যোগ করতে।

কোন লাইন তিনি পছন্দ করলেন বা কি কি নম্বর তিনি লিখেছেন, তা যেন গোপন রাখেন। তারপর সে ছক-কাগজটা নিয়ে একটা দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেই ছাই হাতে নিয়ে তার নিজের বাঁ হাতের ওপর ঘষতে আরম্ভ করলেন। অবাক কান্ড। ঐ ছাইয়ের ঘষায় হাতের ওপর পরিষ্কারভাবে বড় বড় করে সে যোগফলটা ফুটে উঠল। সংখ্যাগুলোর যোগফলটা জাদুকর জানতেন না। তবু সেটাকে পরিষ্কারভাবে তাঁর হাতে ফুটে উঠতে দেখে সবাই চমকে গেলেন।

96	11	89	68
88	69	91	16
61	86	18	99
19	98	66	81

এবার তোমাদের আমি কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি। আগেই বলেছি, খেলাটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে। প্রথমটা হচ্ছে—যোগফলটা জানতে পারা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে—সেটাকে হাতের ওপর ফুটিয়ে তোলা। খুব চমকদার হলেও অতি সহজ এর কৌশল। জাদুকর দর্শকদের যে নম্বরের ছকটা দিয়েছিলেন সেটা আসলে হচ্ছে একটা ম্যাজিক করা ছক। ও'খানে নম্বরগুলো বেশ হিসাব করে সাজানো আছে। ছকটা আমি তোমাদের জন্য এঁকে দিলাম। খেয়াল করে দ্যাখো, এর পাশাপাশি, লম্বালম্বি অথবা কোণাকুণি যেভাবেই হোক না, যে কোনও লাইনের চারটে খোপকে যোগ করলে যোগফল সবসময়েই ২৬৪ হচ্ছে। একবারের বেশি একই দর্শকের সামনে খেলাটা দেখিও না, মাত্র একবার দেখলে তাঁরা ঐ ছকের চালাকিটা বুঝতে পারবেন না। ভাববেন, ইচ্ছে মতো নম্বর বেছে নেয়া হয়েছে এবং

তার যোগফল জানা জাদুকরের পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এ তো গেল ম্যাজিকটার প্রথম পর্ব। অর্থাৎ, দর্শকদের বেছে নেয়া সংখ্যাগুলো যোগফল কত, তা তুমি আগের থেকেই জানতে পারবে। সেটা সবসময়েই ২৬৪।

এবার হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ। একটা সাবানের টুকরোকে ছুরি দিয়ে কেটে সরু করে নাও। আর তারপর সেই সরু সাবান একটু পানিতে ভিজিয়ে বাঁ হাতের ওপর চেপে ঘষে ঘষে ২৬৪ নম্বরটা লেখ। খেয়াল রেখো, লেখাটা যেন ধেবড়ে না যায়। সেজন্যই সাবানটা সরু করে কেটে নিতে বলেছি। এবার ঐ সাবান হাতে শুকিয়ে গেলে খেয়াল করে দ্যাখো, সেখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে হাত একদম পরিষ্কার। কাগজের ছাই নিয়ে একটু ঘষলেই দেখবে— ঐ সাবান লাগানো অংশেই শুধু গাঢ় কালো দাগ পড়ছে। দেখে তুমি নিজেই অবাক হয়ে যাবে। দর্শকরা তো আর এ প্রস্তুতির কিছু জানবেন না, তাঁরা ভাববেন, ম্যাজিক করেই সংখ্যাটা হাতের ওপর লেখা হয়ে গেল।

এপ্রিল ফুলের ম্যাজিক

এপ্রিল মাসে "এপ্রিল ফুল।" কিন্তু সে তো পয়লা এপ্রিলের ব্যাপার। যাকগে সামনের প্রতিটি বছরেও তো পয়লা এপ্রিল থাকবে। তখনকার কথা ভেবে আমি এপ্রিল ফুল করার একটা ম্যাজিক শেখাচ্ছি। এটা একটা ছোট্ট হিসেবের ম্যাজিক, তবে মোটেই কঠিন কিছু নয়। ঠিকমত দেখাতে পারলে সবাই জব্দ তো বটেই, খুব অবাকও হয়ে যাবেন।

ম্যাজিকটা কিছুদিন আগে আমি আমার এক ভাগ্নে অমিতকে দেখিয়েছিলাম। অমিতকে জব্দ করা ভীষণ মুশকিল, কারণ ও একটা চলন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া। কথা বললে মনে হয় পৃথিবীর সব কিছুই ও জেনে বসে আছে। একটা কিছু করতে গেলেই ও আগের থেকেই গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, ব্যাপারটা কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু এ ম্যাজিকটায় ও একেবারে জব্দ।

```
     ৩২১
   − ১২৩
   ─────
     ১৯৮
   + ৮৯১
   ─────
     ১০৮৯০০০০০০
    −৭৩৩৩৬১৫৭৩
   ──────────────
      ৩৫৫৬৩৮৪২৭
```

LOOF LIRPA

প্রথমে দর্শককে বল তোমাকে না দেখিয়ে তিন সংখ্যার একটা নম্বর লিখতে। তার প্রথম এবং শেষ সংখ্যাটার তারতম্য যেন একের বেশি হয়। এবার ঐ নম্বরটা উল্টিয়ে নিয়ে প্রথম নম্বরের তলায় লিখে বিয়োগ করতে হবে। উল্টোবার পরে যদি সংখ্যাটা বড় হয়ে যায় তাহলে সেটা ওপরে লিখে প্রথম সংখ্যাটা দিয়ে বিয়োগ কর। এবার উত্তরটা যা হল তার ঠিক নিচে ঐ উত্তরের নম্বরটাকে উল্টিয়ে লিখে সে-দুটো যোগ করতে বল। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল কি? ধরা যাক, প্রথমে সংখ্যা নেয়া হয়েছিল ৩২১। সেটাকে উল্টিয়ে নিলে হল ১২৩। ঐ ৩২১ থেকে ১২৩ বিয়োগ করলে হয় ১৯৮। এখন ঐ উত্তরটাকে উল্টে দিলে হচ্ছে ৮৯১। আমি ঐ ১৯৮-এর সঙ্গে ৮৯১ যোগ করতে বলছি। আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ।

এবার যে যোগফলটা দাঁড়াল তার পেছনে ছটা শূন্য লাগিয়ে ৭৩৩, ৩৬১, ৫৭৩ এ সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ করতে বল। এত ঝকমারি দেখে তোমার দর্শক নিশ্চয়ই খুব খেপে যাবে। তখন তাকে সামলে নিয়ে বল, এটা যে-সে ম্যাজিক নয়। এটা হচ্ছে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ম্যাজিক এবং এতে একটু কষ্ট করতেই হবে। দর্শক সেই বিয়োগটা ঠিকমত করার পরে তুমি বলবে, অনেক খাটা-খাটুনি হয়েছে ঠিক, কিন্তু আসল কাজটা করা হয়ে গেছে। এই এত যোগ বিয়োগ করে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা কোনমতেই তোমার অর্থাৎ জাদুকরের জানা সম্ভব নয়। দর্শকের ইচ্ছেমতো সংখ্যা থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। তা যাই হোক না কেন, এ উত্তরটা আসলে হচ্ছে একটা বার্তা বা সংবাদ। সংখ্যাগুলোর মানে খুঁজে পেলেই সে সংবাদ পড়া যাবে। সংখ্যাটাতে যদি কোন ৩ থাকে তো তার তলায় "L" লিখতে বল, প্রত্যেকটা ৫-এর তলায় "o" ৬-এর তলায় "F", ৮-এর তলায় "I", ৪-এর তলায় "R", ২-এর তলায় "P" এবং ৭-এর তলায় "A" লিখে সংখ্যাটা একজন দর্শককে উল্টো দিক থেকে পড়তে বল, দেখবে সে কেমন

জব্দ হয়ে গেছে। কারণ, ঐভাবে পড়লে লেখাটা দাঁড়াবে "APRIL FOOL"

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, ভাবছ, এটা কিভাবে সম্ভব। আসলে এটা হচ্ছে একটা অঙ্কের ম্যাজিক। আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবে হিসেব করলে সব সময়েই দেখবে উত্তরটা একই হচ্ছে।

এ খেলাটা তোমরা আবার অন্যভাবেও দেখাতে পার। প্রথমে সেই একইভাবে বল তিন সংখ্যার একটা নম্বর লিখে সেটা উল্টিয়ে বাদ দিতে। উত্তরটা উল্টিয়ে ঐ আগের মতই আবার যোগ করতে বল। যোগফল যা দাঁড়াল তার সঙ্গে আবার ৯ যোগ করতে বল। এবার ঐ সংখ্যাটাকে এক লক্ষ থেকে বিয়োগ দিতে বল। খেয়াল করে দেখবে, এ বিয়োগফল সব সময়েই ৯৮৯০২ হচ্ছে। তুমি যে উত্তরটা জান, বলবে না কিন্তু। এবার যাকে জব্দ করতে চাও তাকে বল উত্তরের প্রত্যেকটা ৯-এর তলায় I লিখতে, ৮-এর তলায় D লিখতে, O-গুলো O-ই থাকবে, কিন্তু ২-এর তলায় T লিখতে হবে। দেখবে লেখাটা হয়ে গেছে "IDIOT"।

হ্যাঁ, একটা কথা, এ খেলাটা কিন্তু সত্যিকারের ইডিয়ট বা বুদ্ধুদের দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ, তারা যোগ-বিয়োগে ভুল করলে ম্যাজিকটা হবেই না। আর একটা জিনিস খেয়াল রেখ, প্রথম তিন সংখ্যার নম্বরটার প্রথম এবং শেষ সংখ্যার তারতম্য যেন একের বেশি হয়। তা না হলে ম্যাজিক কিন্তু হবেই না।

শূন্যে ভাসার ম্যাজিক

অনেকদিন আগের কথা, বাবা একটা খেলা দেখিয়েছিলেন সেটা হল, স্টেজের ওপর পাশাপাশি চারটে চেয়ার সাজানো রয়েছে। একটা মেয়েকে হিপনোটাইজ করে ঐ চেয়ার চারটের ওপর শুইয়ে দেয়া হল। মেয়েটার মাথাটা রয়েছে প্রথম চেয়ারের ওপর, গোড়ালি রয়েছে চতুর্থ চেয়ারের ওপর, আর শরীরটা রয়েছে মাঝখানের অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেয়ার দুটোর ওপর। প্রথমে বাবা মাঝের ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেয়ার দুটোকে সরিয়ে দিলেন। অবাক কান্ড! মেয়েটা মাথা ও গোড়ালিতে ভর দিয়ে তখনও সটান শুয়ে রয়েছে। তারপর ক্লাইম্যাক্স। গোড়ালির তলা থেকে চতুর্থ চেয়ারটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলা হল। আশ্চর্য! মেয়েটা শুধু ঐ মাথায় ভর করেই শূন্যের ওপর রয়ে গেল। চেয়ারের ওপর শুধু মাথা রেখে শূন্যে শুয়ে থাকা দেখে সবাই খুব অবাক হতেন।

এবার তোমাদের যে খেলাটা শেখাব সেটা লেখার সময় আমার উপরোক্ত ম্যাজিকটার কথাই বারবার মনে পড়ছে। কারণ কৌশল বা জিনিসটা এক না হলেও এ খেলাটা ঐ শূন্যে ভাসমান তরুণীরই এক ছোট্ট সংস্করণ বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। এবার আসল ম্যাজিকটার কথায় আসা যাক।

জাদুকরের টেবিলের ওপর একটা সাধারণ জাদুলাঠি এবং দুটো সিগারেটের বাক্স রয়েছে। জাদুকর সিগারেটের বাক্স দুটোকে একটু দূরে দূরে সাজিয়ে তার ওপর জাদুলাঠিটা রেখে দিলেন। অর্থাৎ বাক্স দুটোর ওপর ভর করে লাঠিটা শুয়ে রইল। এবারে তিনি আস্তে আস্তে ডানদিকের বাক্সটা সরিয়ে নিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই লাঠিটা টেবিলে পড়ে গেল। জাদুকর আবার লাঠিটাকে বাক্স দুটোর ওপর শুইয়ে জাদুর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন আর তারপর বাঁদিকের বাক্সটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলেন। কি আশ্চর্য! ঐ ডানদিকের বাক্সটার ওপর একটু ভরে রেখে পুরো লাঠিটা সটান শূন্যে ভেসে রয়েছে।

তোমরা ভাবছ, ম্যাজিকটা ভীষণ কঠিন, তাই নয় কি? অদৃশ্য সুতোর কারসাজি বা চুম্বকের সাহায্য ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়তো ভাবছ। আসলে এটা একটা ভীষণ সহজ খেলা। সামান্য একটু অভ্যাস করলে তোমরাও দেখাতে পারবে।

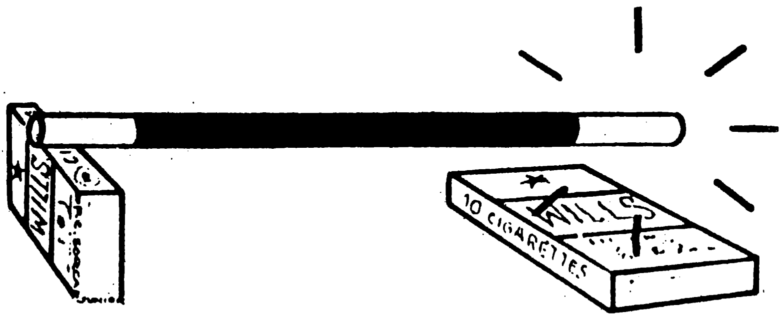

ফুটখানেক লম্বা একটা হালকা বাঁশের টুকরো দিয়ে ঐ জাদুলাঠি তৈরি। বাঁশ না পেলে কাগজের পাইপ দিয়েও কাজটা সারা যায়। প্রথমে করতে হবে কি, পাইপটার একটা মুখ বন্ধ করে অন্য একটা মুখ দিয়ে একটা কর্কের ছিপি জোর করে ঢুকিয়ে পাইপটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আটকে রেখে দাও। আর তারপর একটা সীসে বা অন্য কিছুর ভারি বল পাইপটার ভেতর ঢুকিয়ে দ্বিতীয় মুখটাও বন্ধ করে দাও। ব্যস্! এ হল প্রস্তুতি। পাইপটাকে এবার জাদুলাঠির মতো মাঝখানটা কালো আর দু-পাশ সাদা রং করে দিলে সবাই ভাববেন এটা একটা সাধারণ জাদুলাঠি। লাঠিটা কাত করলে যখন বলটা গড়িয়ে এক প্রান্তে আসবে তখন সেই প্রান্তের

সিগারেটের বাক্সের ওপর ঐ বলের ওজনেই লাঠিটা সটান শুয়ে থাকবে। মনে হবে যেন হাওয়ায় ভেসে আছে। আর বলটা যখন মাঝখানে থাকবে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যাকর্ষণের টানে লাঠিটা পড়ে যাবে। আশা করছি, ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ।

হ্যাঁ, একটা কথা। তোমরা বোধহয় ভাবছ ঐ ছিপিটা মাঝখানে রেখে কি লাভ হল? ঐ ছিপিটা যে কতটা সাহায্য করবে তা লিখে বুঝানো মুশকিল। তোমরা নিজেরাই দেখাবার সময় বুঝতে পারবে সেটা কতটা প্রয়োজনীয়। ঐ

ছিপিটা থাকার জন্য জাদুলাঠি সামান্য একটু কাত করলেই খেলাটা দেখানো যাবে। তা না হলে লাঠিটাকে এতটা কাত করতে হবে যে সেটা দর্শকের চোখে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকবে।

জাদুলাঠির জাদু

আমাদের দেশে বেদেরা সাধারণত মরা মানুষের অথবা অন্য কোন জানোয়ারের হাড় নিয়ে জাদুকাঠির কাজ করে থাকেন। সে রকম চীন বা জাপান দেশের জাদুকররা একটা গাছের বাঁকা ডাল নিয়ে জাদুকাঠির কাজ সারেন। পাশ্চাত্য দেশে নানারকম জাদুকাঠির প্রচলন আছে। কেউ কেউ লম্বা বেতের ছড়ি ব্যবহার করে থাকেন। কেউ বা আবার সরু লম্বা কাঠের ফালি দিয়ে জাদুকাঠি বানান। তবে সব থেকে প্রচলিত জাদুকাঠি হচ্ছে— ফুটখানেক লম্বা একটা কাঠের রডকে কালো রং করে তার দু-প্রান্তে ইঞ্চিখানেক সাদা রং করে ব্যবহার করা।

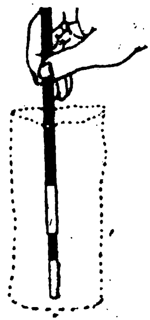

এখন তোমাদের আমি একটা জাদুকাঠির স্পেশাল ম্যাজিক শেখাব। এটা দেখাতে হলে কিছু পূর্বপ্রস্তুতি এবং সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন আছে। তবে সেগুলো মোটেই ঝামেলার কিছু নয়। তোমরা সহজেই বানিয়ে নিতে পারবে।

প্রথম থেকে শুরু করছি। জাদুকরের হাতে একটা সাধারণ জাদুকাঠি আর দুটো ঠোঙা রয়েছে। জাদুকাঠিটা তিনি টেবিলের ওপর ঠক্ ঠক্ করে ঠুকে দেখালেন, ওটা শক্ত কাঠের তৈরি। এবার প্রথম ঠোঙাটা নিয়ে দর্শকদের দেখালেন, সেটা একদম খালি। টেবিলের ওপর সেই ঠোঙাটা রেখে জাদুকর তার জাদুকাঠিটা নিয়ে তার ভেতর একটু ঘুরিয়ে কাঠিটা আবার বের করে আনলেন। তারপর দ্বিতীয় ঠোঙাটা নিয়ে তার ভেতর জাদুকাঠিটা রেখে দিয়ে ঠোঙার মুখটা বন্ধ করে দিলেন। দর্শকরা দেখলেন,

থম ঠোঙাটা একদম খালি আর দ্বিতীয় ঠোঙাটায় জাদুকাঠিটা রয়েছে। বার জাদুকর ঐ জাদুকাঠি সহ দ্বিতীয় ঠোঙাটাকে হাতে নিয়ে ওয়ান, টু, থ্রি লে কুচকে দুমড়ে একটা ছোট কাগজের বল বানিয়ে ফেললেন। ফুটখানেক ম্বা শক্ত জাদুকাঠিট কুচকে দুমড়ে ঐ ছোট্ট কাগজের বলে নিশ্চয়ই থাকতে ারে না। খুব চমকে গেলেন তাঁরা। নিশ্চয়ই তাহলে সেটা ওখানে নেই। থম ঠোঙাটাকে জাদুকর এবার দর্শকদের সামনে আনলেন। কি আশ্চর্য! াদুকাঠিটা অক্ষত অবস্থায় তার মধ্যে রয়েছে। সবাই দেখেছিলেন, প্রথম াঙাটা খালি এবং দ্বিতীয় ঠোঙাটায় জাদুকাঠিটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভাবে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর কিভাবেই বা সেটা প্রথম ঠোঙায় ফিরে ল, ভেবে সবাই অবাক।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ খুব কঠিন ম্যাজিক এটা। আসলে এর কৌশল ন্তু খুব সহজ। যত কারসাজি ঐ জাদুকাঠির মধ্যেই করা ছিল। এ লাটার জন্য প্রথমে তোমাকে একটা জাদুকাঠি বানাতে হবে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে সারবার জন্য তোমরা একটা আস্ত পেনসিল দিয়েও জাদুকাঠি নাতে পারো। একটা গোল পেনসিল নিয়ে সেটাকে প্রথমে কালো রং রো, আর তারপর সেই পেনসিলের দু'প্রান্তে ইঞ্চিখানেক সাদা রং করে ও। এ হল তোমার ব্যক্তিগত জাদুকাঠি। এবার করতে হবে কি, ঐ নসিলের ওপর কালো কাগজ মুড়িয়ে পাইপের মতো একটা খাপ বানাতে ব। সে খাপের দু'প্রান্তে তোমার জাদুকাঠির মতই সাদা রং করে দিতে ব। খাপটা যেন একদম টাইট হয়ে পেনসিলের সঙ্গে চেপে লেগে না কে। এরকমভাবে বানাতে হবে যেন খাড়া করে ধরলে ভেতরের নসিলটা স্লিপ খেয়ে নিজের থেকেই খাপ থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ঙুল দিয়ে জোরে চেপে ধরলে যেন না স্লিপ খায়। ব্যস! এই হল তোমার তি। এবার চাই দুটো ঠোঙা। অবশ্যই ঠোঙাদুটো পেনসিলের চেয়ে বড় ত হবে। প্রথম ঠোঙাটা খালি দেখিয়ে তার ভেতর জাদুকাঠি ঘোরাবার য়ে খাপ সহ জাদুকাঠিটা একটু ঢিলে করে ধরলেই খাপের ভেতর থেকে নসিলটা স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে এসে ঠোঙার ভেতরে থেকে যাবে। আর রপর যেন পুরো জাদুকাঠিটাই তুলে আনা হয়েছে এমন ভান করে শুধু ই কাগজের খাপটাকে দ্বিতীয় ঠোঙায় রাখ। দেখে মনে হবে যেন সেই দুকাঠিটাই দ্বিতীয় ঠোঙায় রাখা হল। কাগজের তৈরি জাদুকাঠি সহ ীয় ঠোঙাটিকে দুমড়ে ছোট বল তৈরি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। দর্শকরা ভাবলেন, শক্ত জাদুকাঠিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আশা করি, ্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। ছবি দেখলে সব কিছু আরও পরিষ্কার

দড়ির ম্যাজিক

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় একদল বাঙালি জাদুকর অনেক মজার ম্যাজিক দেখিয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী 'জাহাঙ্গী নামা'তে সে-কথা বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন।

ঐ জাদুকররা যে সমস্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে সম্রাটকে মুগ্ধ করেছিলেন তার মধ্যে সেই জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় দড়ির খেলাটাও ছিল। আজ তোমাদে যে ম্যাজিকটা শেখাব সেটা ঐ দড়ির খেলারই একটা ছোটখাটো সংস্করণ এবং ম্যাজিকটা হল একটা সাধারণ দড়িকে জাদুবলে কিভাবে শক্ত লাঠি মতো করে দেখানো যায়।

জাদুকর সবার সামনে এক গজের মতো লম্বা একটা মোটা দড়ি এনে সেটাকে পাকিয়ে গোল করে তারপর আবার পাক খুলে সোজা করে ঝুলিয়ে ধরে দুলিয়ে দেখালেন, সেটা মোটেই শক্ত নয়। যে কোন সাধারণ দড়ির মতই নরম। এবার তিনি দড়ির মাঝখানটা ধরে জাদুর ভঙ্গিমায় হাত নাড়লেন। কি আশ্চর্য দড়িটা আস্তে আস্তে লাঠির মতো শক্ত হয়ে গেল। দর্শকদের একজনকে হাত দিয়ে ঐ দড়িতে চাপ দিতে বলা হল। তিনি চেপে দেখলেন, দড়িটা লাঠির মতোই শক্ত হয়ে গেছে।

এবার জাদুকর ঐ দড়ি-লাঠিটাতে একটু ফুঁ দিলেন। অবাক কান্ড দড়িটা সঙ্গে সঙ্গেই অমনি কেমন যেন নরম হয়ে গেল। তোমরা ভাবা নিশ্চয়ই বহুত কারসাজি আছে এর ভেতর? হ্যাঁ, কারসাজি নিশ্চয়ই কর আছে, তবে সেটা খুব সহজ। তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে এটাকে।

এ খেলাটা করতে গেলে চাই একটা মোটা দড়ি, আর একটা সাইকেলের চেন। পুরনো একটা সাইকেল-চেন জোগাড় কর, আর তারপর তার একটা জোড়া খুলে নিয়ে লম্বা করে ধর। দেখবে সেটা ঠিক নরম দড়ির মতোই ঝুলছে। কিন্তু চেনটাকে যদি পাশের দিকে কাত কর, তাহলে

দেখবে সেটা কেমন শক্ত হয়ে গেছে। মোটেই দুলছে না। সাইকেলের চেনের ধর্মই এটা। সামনে পেছনে বাঁকানো গেলে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো সম্ভব নয়। এ চেনটাকে যদি এখন দড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ঐ দড়িটার ধর্মও চেনের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ একদিকে পাকানো-বাঁকানো সম্ভব, কিন্তু অন্যদিকে সম্ভব নয়। সেদিকে বাঁকাতে গেলেই লাঠির মতো শক্ত হয়ে থাকবে। দড়িটার মাঝ বরাবর ধরে পাশের দিকে কাত করলে দড়িটা লাঠির মতো শক্ত হবে, কেউ চাপ দিলেও ওটাকে বাঁকাতে পারবে না। তারপর আবার চেনটাকে একটু পাক খাইয়ে, বেঁকিয়ে ধরলেই ওর ধর্ম অনুযায়ীই 'নরম' হয়ে যাবে। দর্শকরা তো আর এত কিছু জানবেন না, তাঁরা অবাক হয়ে দেখবেন।

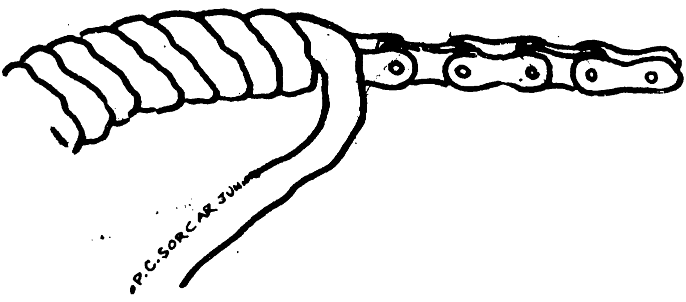

বিখ্যাত ভারতীয় দড়ির খেলার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই। দুটোর কৌশল একদম আলাদা, কিন্তু তবুও যখন তোমরা এটা দেখাবে তখন দেখবে, সবাই-ই ভাবছেন, এটা ঐ ভারতীয় দড়ির খেলারই একটা জুনিয়র সংস্করণ। তৈরি করে ভালভাবে অভ্যাস করে দেখিও, দেখবে সবাই কেমন অবাক হচ্ছেন।

দড়ি কাটার খেলা

দড়ি কেটে জোড়া লাগাবার একটা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যারা প্রায়ই ম্যাজিকের অনুষ্ঠান দেখ তারা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও এ খেলা দেখেছ।

বড় বড় ম্যাজিশিয়ানরা—ক্যাঁচ করে দড়ি কেটে ফেলে কেমন মন্ত্রর মতো তা আবার জোড়া লাগিয়ে দেন। মনে রাখবে, সে রকম দেখাতে অনেক অভ্যাস, অনেক লেখাপড়া আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তার সঙ্গে এখানে যেটা শেখাচ্ছি তার তুলনা করো না, বা দুটোকে মিলিয়ে ফেল না। তোমাদের যেটা শেখাচ্ছি সেটা হলো তোমাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি সহজতম পদ্ধতি।

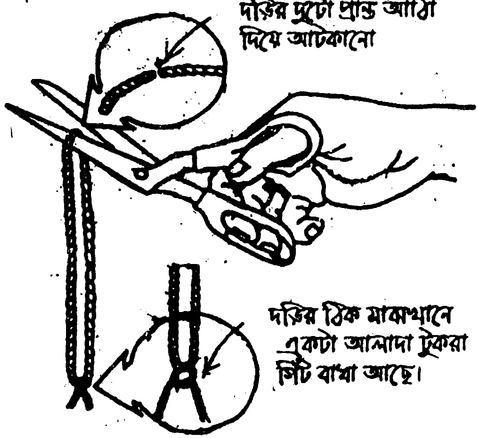

জাদুকরের হাতে একটা সাধারণ দড়ি রয়েছে। তার দু'প্রান্ত এক জায়গায় করে গিট বাঁধা আছে। জাদুর একটা কাঁচি নিয়ে ঐ দড়িটার মাঝামাঝি এক জায়গায় কেটে ফেললেন অর্থাৎ দড়িটা দু-টুকরো হলেও

গিট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। এবারে জাদুকর কাঁচি দিয়ে ঐ গিটটাকে কেটে ফেললেন। সেটা কেটে গিয়ে টুপ করে খসে পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য, দড়ির টুকরো দুটো জোড়া লেগে একটা হয়ে গেছে। দড়িটা টেনেটুনে সবাই দেখলেন। না! সত্যিই তো জোড়া লেগে গেছে!!

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছ কিভাবে সম্ভব এটা। খেলাটা কিন্তু খুবই সহজ। বুঝে একটু অভ্যাস করলেই দেখবে এর থেকে সহজ ম্যাজিক বোধ হয় দুনিয়ায় নেই। এর জন্য চাই ফুট তিনেক লম্বা একটা দড়ি, একটা কাঁচি আর একটু ভাল আঠা।

প্রথমে প্রস্তুতি হিসেবে দড়িটার এক প্রান্ত থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা ছোট একটা টুকরো কেটে নাও আর সেই টুকরোটাকে দড়িটার ঠিক মাঝখানে বাঁধো। খেয়াল করে দেখ ঐ টুকরোটা বাঁধা আছে বলে মনে হচ্ছে—যেন দুটো প্রায় সমান টুকরোর দড়ি গিট বেঁধে একসাথে আটকানো রয়েছে। ওটা যে আসলে একটাই দড়ি এবং মাঝখানের গিটটা যে আলাদা ছোট্ট একটা টুকরো তা কিন্তু মনেই হবে না। এবার দড়িটার দুটো প্রান্ত এক জায়গায় করে আঠা দিয়ে আটকিয়ে দাও। আঠা শুকিয়ে গেলে মনে হবে যেন একটা দড়িই সেখানে রয়েছে—আর তার প্রান্ত দুটো যেন গিট দিয়ে আটকানো রয়েছে। দড়ির আসল প্রান্ত দুটোকে মনে হচ্ছে যেন মাঝখান আর সত্যিকারের মাঝখানটাকে মনে হচ্ছে যেন দুটি প্রান্ত। ছবি দেখলে অথবা নিজে বানিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি মজার। ব্যস্ এই হল প্রস্তুতি।

এবার দর্শকদের এ দড়ির রিংটা দেখালে সাধারণ একটা দড়ির দু প্রান্তে গিট বাঁধা বলেই সবাই ভাববেন। এখন দড়ির মাঝখানটা কাটা হচ্ছে বলে ঐ আঠা লাগানো অংশটাকে কাঁচির টানে খুলে ফেললে মনে হবে দড়িটা দু টুকরো হয়ে গেল। এবার ঐ আলগা গিটাকে কেটে ফেললে–ব্যস্! সত্যিকারের ম্যাজিক! দড়িটা একদম আগের অবস্থায় ফিরে এল–কিন্তু দর্শকরা গেলেন চমকে আর ভাবলেন ম্যাজিক করে সেটা জোড়া লেগে গেছে।

অদ্ভুত মুখস্থ শক্তি

এবারে যে ম্যাজিকটা তোমাদের শেখাব, সেটা একটু অভ্যাস করে দেখালে সবাই ভারবেন যেন মন্ত্র দিয়ে হচ্ছে। মনে আছে, খেলাটা প্রথম যখন আমি বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়েছিলাম তখন তারা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে এটা দেখাচ্ছি এবং এতে কোনও কৌশল থাকতেই পারে না।

প্রথম থেকেই বলছি। এক প্যাকেট তাস দর্শকদের হাতে দিয়ে সেটা ভাল করে মিশিয়ে দিতে বলা হল। দর্শকরা মিশিয়ে দেয়ার পর জাদুকর পুরো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললেন, "আমি খুব তাড়াতাড়ি এ তাসগুলোকে একটু দেখব আর ঐ একবার দেখলেই তাসের কোন্‌টা কোথায় রয়েছে তা আমার মুখস্থ হয়ে যাবে।" এ বলে জাদুকর তাসগুলোর ওপর খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ সব মুখস্ত হয়ে গেছে।" এরপর জাদুকর পুরো প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে দর্শকদের একজনকে বললেন, তাসগুলোকে চারভাগে ভাগ করতে। প্রথমে দুভাগ আর তারপর তার থেকে আবার দুভাগ দুভাগ করে মোট চারভাগ। দর্শক তাঁর ইচ্ছেমতো জায়গা থেকে ঐ চারটে ভাগ করার পর জাদুকর বললেন, দর্শকরা যেখান থেকেই ভাগ করুন না কেন, কোন্ তাস কোথায় আছে তার সবই তাঁর জানা। তারপর তিনি ঐ চারভাগ তাসের ওপরের তাসগুলোকে না দেখেই একের পর এক বলে যেতে লাগলেন। ধরা যাক প্রথম অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন 'ইস্কাবনের টেক্কা', তারপর সে তাসটাকে হাতে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন 'হরতনের সাহেব', সেটা হাতে তুলে নিয়ে তৃতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন 'রুহিতনের পাঁচ' আর তারপর সেটা হাতে নিয়ে শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন, 'চিড়াতনের নয়'। সেটাকেও তিনি হাতে তুলে নিয়ে চারটে তাসই দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন। অবাক কান্ড। সত্যি

সত্যিই জাদুকরের হাতে ইস্কাবনের টেক্কা, হরতনের সাহেব, রুহিতনের পাঁচ আর চিড়িতনের নয়ই রয়েছে।

তোমরাও নিশ্চয় খুব অবাক হচ্ছ। ভাবছ বাহান্নটা তাসের কোন্‌টা কোথায় রয়েছে, তা মুখস্থ করা নিশ্চয়ই মহা কৃতিত্বের ব্যাপার। আসলে কিন্তু তাসগুলো মুখস্থ করার কোন ব্যাপারই এতে নেই। একটা ছোট্ট কিন্তু মজার কৌশলে এটা হচ্ছে। তাসগুলোকে মুখস্থ করার জন্য দেখার সময় শুধুমাত্র সবচেয়ে ওপরে কোন্‌ তাসটা রয়েছে সেটা খেয়াল রাখলেই চলবে। ধরা যাক, প্যাকেটের সবচেয়ে ওপরে ছিল ইস্কাবনের টেক্কা। " এবারে দর্শক যখনই ঐ প্যাকেটটাকে চার ভাগে ভাগ করবেন—অর্থাৎ প্রথম দুভাগ আর তারপর তার থেকে আর দুভাগ করবেন তখন শুধু খেয়াল রাখতে হবে কোন্‌ ভাগের ওপর ঐ ইস্কাবনের টেক্কা তাসটা রয়েছে। আর সে অংশটার কাজ একদম শেষে করতে হবে। এবারে অন্য একটা ভাগের ওপর তাসটা ছুঁয়ে বলো, "এটা হচ্ছে ইস্কাবনের টেক্কা। " আসলে কিন্তু সেটা মোটেই তা নয়। কিন্তু ঐ 'ইস্কাবনের টেক্কা' বলেই তাসটাকে হাতে তুলে নিতে হবে। হাতে নিয়ে তাসটা দেখ, ধরা যাক সেটা আসলে হরতনের সাহেব। এবার দ্বিতীয় অংশের ওপরের তাসটা ছুঁয়ে বলো, "এটা হচ্ছে হরতনের সাহেব", এবং সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখ। ধরা যাক, আসলে সেটা হচ্ছে রুহিতনের পাঁচ। এ অনুযায়ী তৃতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বলতে হবে রুহিতনের পাঁচ। এবং সেটা দেখে নিয়ে চতুর্থ অংশের ওপরের তাসটাকে বলো চিড়িতনের নয়। আসলে কিন্তু সেটা হচ্ছে সেই ইস্কাবনের টেক্কাটা। এবার হাতের চারটে তাস একটু ফেটিয়ে সেগুলো দর্শকদের সামনে মেলে ধরলে সব কটা তাসই ঠিক ঠিক রয়েছে দেখা যাবে। তাঁরা তো আর এসব কারসাজি বা কৌশলের কথা জানবেন না, ভাববেন বোধহয় ঐ অসাধারণ মুখস্থ করে রাখার ফলেই সব কটা তাস না দেখে বলে দিতে পারছ। তুমি যে একটা দেখে অন্যটা বলছো, তা তাঁরা বুঝতেও পারবেন না। এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিজে নিজে চেষ্টা করে দেখ, কী সহজ অথচ চমৎকার ম্যাজিক এটা।

শিবুর আঙুল

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি স্কুলে ক্লাস সিক্স কিংবা সেভেন-এ পড়ি। মনে আছে একদিন শিবু নামে এক বন্ধু ক্লাসে এসে সবাইকে বলল, "জানিস কালকে ম্যাচ খেলতে গিয়ে আমার একটা আঙুল কেটে গেছে।" দেখলাম, তার বাঁ হাতে একটা বিরাট ব্যান্ডেজ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "আঙুল কেটে গেছে তো এতবড় বিরাট ব্যান্ডেজ কেন?" শিবু একবার উদাসভাবে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নিচু করে বলল, "এ-কাটা যে-সে কাটা নয়। একটা আঙুল পুরো কেটে বাদ হয়ে গেছে।" আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। গতকাল এতবড় একটা ব্যাপারের পর ও আজকে স্কুলে এলো কি করে? এটা নিশ্চয়ই ওর চিরাচরিত ব্যাপার অর্থাৎ বেমালুম মিথ্যে কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপারটা কোথায় হয়েছে"?

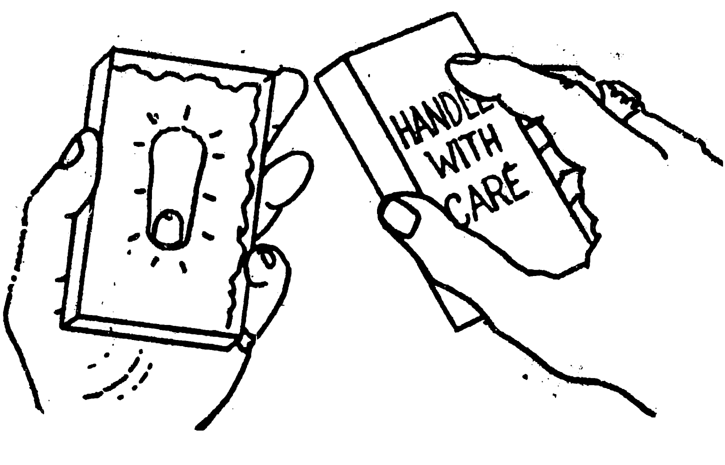

ও বলল, "গতকাল যাদবপুরে ম্যাচ খেলার সময় প্রতিপক্ষের একজন একটা মারাত্মক 'ফাউল' করেছিল।" শিবু নাকি ছিল গোলকিপার, একেবারে 'লাইফ রিস্ক' করে বল ধরেছে—তক্ষুণি প্রতিপক্ষের সেই ষণ্ডামার্কা ছেলেটা বলসমেত ওর হাতেই সজোরে কিক মারে। বলটা তার হাত থেকে ফসকায়নি, তবে বুটের ঠোক্করে একটা আঙুল উড়ে গেছে। সবাই জিজ্ঞেস করল, "আঙুলটা নেই?" ও বলল, "সবাই খোঁজাখুঁজি করছে, পাওয়া গেলে তো ভাল কথা, অপারেশন করে একটা কিছু করা যেত। কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি।" শিবুর এই অহেতুক মিথ্যা কথায় আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে। না চটে গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমার বাড়িতে একস্ট্রা একটা আঙুল আছে, তুমি যদি চাও দিতে পারি।" শিবু তো ফায়ার। বলল, "প্রদীপ, তুমি এ বিপদের সময়ে আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছ?" ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরাও দেখলাম আমার ওপর বেশ চটে গেল। আমি সেজন্য আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, "ঠিক আছে, ছুটির পর বাড়িতে এসো, দেখাব।"

শিবু দমবার ছেলে নয়। সকলের সামনে ও বড় বড় লেকচার দিতে আরম্ভ করল, ফলে ছুটির সময় দেখা গেল অনেক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শিবু আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছে।

আমি বাড়ির ভেতর থেকে একটা পিচবোর্ডের বাক্স নিয়ে এসে বললাম, "আঙুলটা এতে আছে, কিন্তু বেশি হাওয়া লাগানো ঠিক নয়, আমি একবার দেখিয়েই রেখে দেব। অবশ্য শিবু যদি চায় তো ওকে দিয়ে দিতে পারি।" বলে আমি সে বাক্সটা আস্তে আস্তে খুললাম। ভেতরে ভর্তি তুলো, আর সে তুলো একটু ফাঁক করতেই দেখা গেল রক্তমাখা একটা আঙুল। শিবুকে বললাম, আঙুলটা ছুঁয়ে দেখতে সত্যি জ্যান্ত মানুষের আঙুল কিনা। শিবু কাঁপা কাঁপা হাতে একটু ছুঁতেই আঙুলটা কেমন একটু নড়ে উঠল। সবাই

তো একেবারে হতভম্ব। এবার আমার লেকচার দেয়ার পালা। বাক্সটাকে বন্ধ করতে করতে বললাম, "তোমরা ভেবেছিলে আমি মিথ্যে কথা বলছি! ছি, ছি, কি করে তোমরা ভাবলে? যাই হোক শিবুর যদি প্রয়োজন হয় আঙুলটা নিতে পারে।" সবাই শিবুর দিকে তাকাল। শিবু একটু আমতা আমতা করে বলল, "না না, অন্যের আঙুল নিয়ে আমি কি করব? আর তাছাড়া এতক্ষণে আমার নিজের আঙুলটাই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া গেছে।"

শিবু যে মিথ্যে কথা বলছিল, সে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কিন্তু আমি ঐ আঙুলটা পেলাম কোত্থেকে? আসলে এটা একটা ম্যাজিক। ঐ কাটা আঙুলটা আমারই হাতের একটা আঙুল। বাক্সের তলায় একটা ফুটো ছিল আর সে ফুটো দিয়ে আমারই হাতের একটা আঙুল গলানো ছিল। আর ভেতরের তুলোতে একটু একটু লাল রং লাগানো ছিল। সেজন্য দেখে মনে হয় রক্ত মাখা একটা আঙুলের টুকরো বাক্সের ভেতরে রয়েছে। শিবু ছুঁতেই আমি আঙুলটা একটু নাড়িয়েছিলাম। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারবে।

চার টেক্কার ম্যাজিক

এ ম্যাজিকটা আমি ছোটবেলায় বাবার কাছে শিখেছিলাম। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের অবাক করার জন্য বাবাকে আমি প্রায়ই ধরতাম কয়েকটা সহজ ম্যাজিক শিখিয়ে দেয়ার জন্য। যে ম্যাজিকগুলো শিখিয়েছিলেন, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ। মনে আছে যেদিন শিখেছিলাম, সেদিনই আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম। তার মানে বুঝতেই পারছ, এতে খুব বেশি অভ্যাসের প্রয়োজন নেই।

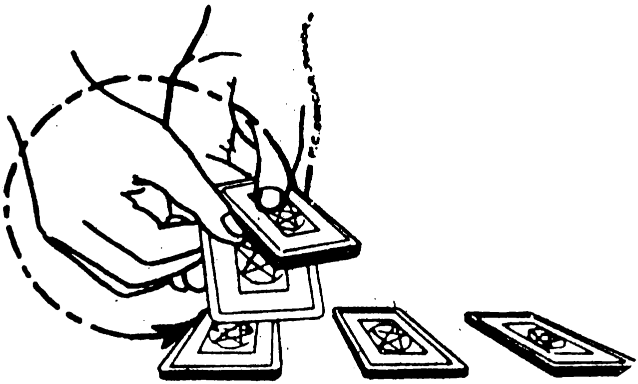

তৃতীয় ভাগের উপর থেকে তিনটে তাস নীচে রাখা হচ্ছে

জাদুকর এক প্যাকেট তাস টেবিলের ওপর রেখে দর্শককে বললেন, সেটাকে মাঝখান থেকে দুভাগ করতে। তারপর প্রথম অংশটা আবার দুভাগ করতে বলা হল। দ্বিতীয় অংশটাকেও একইভাবে আরও দুটো ভাগ করা হল। অর্থাৎ টেবিলের ওপর এখন চার ভাগ তাস রয়েছে। জাদুকর এখন দর্শককে বললেন, "এ চারভাগ তাসগুলোকে একটু মজার করে ফেটিয়ে রাখা যাক।" তারপর তিনি করলেন কী, চারভাগের একটাকে হাতে নিয়ে তার ওপর থেকে পর পর তিনটে তাস নীচে রেখে দিলেন, আর তারপর ঐ ওপর থেকেই আরও তিনটে তাস নিয়ে বাকি তিন ভাগ তাসের ওপরে একটা একটা করে রেখে দিলেন। এটা করার পর দর্শককে বললেন, "ঠিক

একই পদ্ধতিতে তাসের বাকি ভাগগুলোকে ফেলিয়ে রাখুন।" অর্থাৎ দর্শক করবেন কী, দ্বিতীয় ভাগটাকে হাতে নিয়ে তার ওপর থেকে পর পর তিনটে তাস তলায় রাখবেন আর তারপর আরও তিনটে তাস নিয়ে টেবিলের ওপর রাখা বাকি তিনটে ভাগের ওপর একটা একটা করে রেখে দেবেন। একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটাকেও ফেটান হল। জাদুকর এবার চারটে ভাগের ওপর একটু জাদুর ভঙ্গিমায় হাত নাড়লেন। অবাক কান্ড! দেখা গেল চারটে ভাগেরই ওপরের তাসগুলো টেক্কা হয়ে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে বেশ জট পাকানো ম্যাজিক মনে হলেও এটা কিন্তু খুব সহজ ম্যাজিক। প্রথমে এক প্যাকেট তাস থেকে চারটে টেক্কা আলাদা করে নিয়ে প্যাকেটের ঠিক ওপরে রাখ। দর্শক যখন তাসগুলোকে চার ভাগে ভাগ করছেন তখন খেয়াল রেখো সেই টেক্কা চারটে কোন অংশের ওপরে রইল। এই ভাগটাতেই তোমার আসল কৌশল এবং শুধু সেটাকেই তোমার খেয়াল রাখতে হবে। ধরা যাক, চারভাগের চতুর্থ ভাগটার ওপরে টেক্কা চারটে রয়েছে। যদি চতুর্থ ভাগে টেক্কা চারটে থেকে থাকে, তাহলে তোমাকে প্রথম ভাগটা থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রথম ভাগের ওপর থেকে তিনটে তাস নিয়ে তলায় রাখ আর তারপর ওপর থেকে পর পর তিনটে তাস নিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগের ওপর একটা একটা করে রেখে দাও। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল কী, চতুর্থ ভাগের টেক্কা চারটের ওপর একটা অন্য তাস এসে জমা হলো। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় ভাগটা থেকে যখন তিনটে তাস ওপর থেকে নীচে রেখে আরও তিনটে তাস বাকি তিন ভাগের ওপর অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগের ওপর একটা-একটা করে রাখা হল, তখন আসলে খেয়াল করে দেখ চতুর্থ ভাগের টেক্কা চারটের ওপর দুটো তাস জমা হল। তৃতীয় ভাগটাকেও একই জিনিস করা হয়েছিল। অর্থাৎ ওপর থেকে তিনটে তাস তলায় রেখে তারপর আরও তিনটে তাস নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ভাগের ওপর রাখা হয়েছিল। তার মানে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল—চতুর্থ ভাগের টেক্কা চারটের ওপর তিনটে অন্য তাস জমা হয়ে রয়েছে। এবার যখন একই জিনিস চতুর্থ ভাগটাকে করা হল, তখন খেয়াল করে দেখ, টেক্কার ওপরের জমা হওয়া তাস তিনটে ঐ চতুর্থাংশের নিচে চলে গেল এবং ঐ জমা রাখা টেক্কা চারটের তিনটে টেক্কা অন্য তিনটে ভাগের ওপর এক একটা করে জমা হল। এক প্যাকেট তাস হাতে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। দেখবে নিজে নিজেই ম্যাজিকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা তো এ সবের কিছুই জানেন না, তাঁরা ভাববেন, ম্যাজিক করেই বোধ হয় টেক্কাগুলো ওপরে চলে এসেছে।

হাওয়া থেকে রুমাল

খুব ছোট মনে হলেও আসলে কিন্তু এটা একটা বড় ম্যাজিক। সঠিক রিবেশে যদি তোমরা ভালভাবে অভ্যাস করে দেখাতে পারো, তাহলে দখবে জাদুকররাও অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, এটার জন্য শুধু অভ্যাস য়, খুব আত্মবিশ্বাস এবং সাবলীল অভিনয়-এর প্রয়োজন।

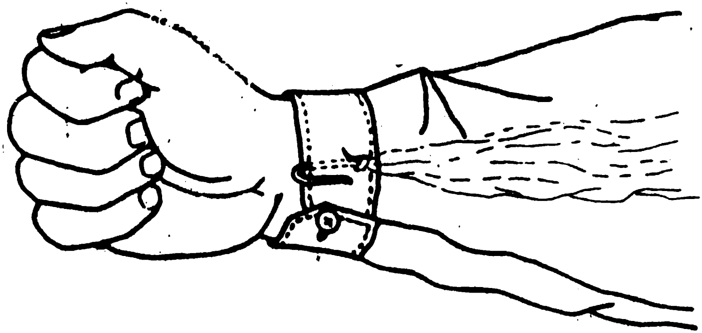

আংটাটা চোঙায় আটকে দেওয়া হয়েছে

জাদুকর একটা দু ফুট লম্বা আর দু ফুট চওড়া সাধারণ পিচবোর্ডের টুকরো দর্শকদের দেখালেন, কোন কৌশল নেই তাতে। এবার জাদুকর সবার সামনে সেই পিচবোর্ডটাকে গোল করে একটা চোঙা বানালেন আর তারপর দুটো রাবার ব্যান্ড দিয়ে সেটাকে আটকে রাখলেন। দর্শকরা সবাই দেখলেন তাঁদের চোখের সামনেই ঐ চোঙাটাকে তৈরি করা হল এবং তাতে গোপন কিছু নেই। জাদুকর এবার চোঙাটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে আরো পরিষ্কার করে দেখালেন চোঙাটার ভেতরে কিছু নেই। এবার চোঙাটাকে একটা টেবিলের ওপর রেখে জাদুকর তার হাতের আস্তিন গুটিয়েও দেখালেন—বেমালুম খালি। অবাক কাণ্ড! দেখা গেল ঐ চোঙার ভেতরে নানা রঙের কয়েকটা রুমাল চলে এসেছে। চোঙাটাকে বার বার খালি

দেখানো হয়েছিল এবং পিচবোর্ডটাতেও কোন কৌশল নেই। কিন্তু তবুও ঐ রুমালগুলো এল কোত্থেকে ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

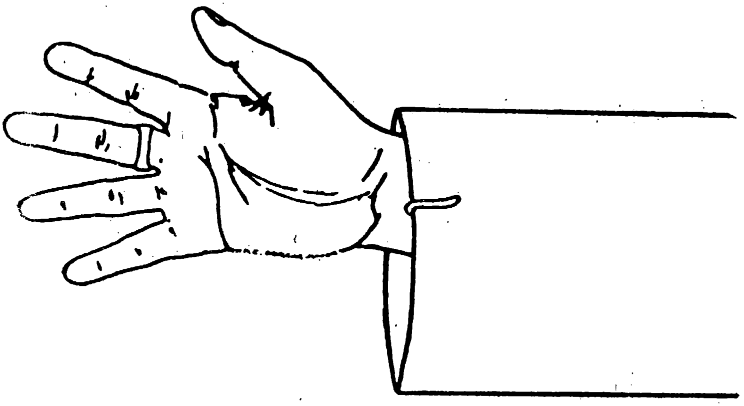

আংটাটা আস্তিন থেকে এইভাবে বেরিয়ে থাকবে

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ অনেক হাতের কারসাজি আছে বোধহয় এটাতে। মোটেই কিন্তু তা নয়। কৌশলটা জানলেই তোমরা বুঝতে পারবে এটা কত সহজ। প্রথমে তোমাদের করতে হবে কী, তিনটে সিল্কের রুমাল নিয়ে তিনটেরই এক একটা মাথা এক জায়গায় করে গিট বাঁধো। এবার একটা ছোট্ট লোহার তার নিয়ে একটা বড়শির মত আংটা বানিয়ে ঐ গিঁটের সাথে লাগিয়ে রাখ। ব্যস, এই হল তোমার কৌশলের সরঞ্জাম! এবার তোমার ডান হাতের জামার আস্তিনের তলায় ঐ রুমালগুলো আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে রাখ যেন বাইরে থেকে রুমালগুলো দেখা না যায়, আস্তিন থেকে বেরিয়ে থাকবে শুধু ঐ বড়শির মত আংটাটা। চোঙাটাকে খালি দেখাবার সময় যখন ডান হাত ঢুকিয়ে দেখাচ্ছ, তখন কায়দা করে ঐ আংটাটা চোঙার মাথায় আটকে দিতে হবে। এবার যখন হাতটা চোঙা থেকে বাইরে বের করে আনবে, তখন আংটার সাথে লাগানো রুমালগুলো ঐ চোঙার ভেতরেই থেকে যাবে। দর্শকরা কেউই সেটা জানবেন না। এখন জামার হাতার আস্তিন গুটিয়ে খালি দেখিয়ে দর্শকদের কাউকে বল চোঙাটা ধরে থাকতে আর তুমি ওপর থেকে হাত ঢুকিয়ে রুমালগুলো বের করে নিয়ে এস। দেখবে কি দুর্দান্ত নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

গন্ধ শোঁকার জাদু

এ খেলাটা আমি জার্মানির টেলিভিশনে দেখিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে খেলাটা এত সহজ যে, এর কৌশল জানলে তোমরা ভাববে, ইস্, ওরা কী বোকা! এটাও বুঝতে পারল না?

আসলে কিন্তু বোকা-চালাকের কোন প্রশ্ন নেই এতে। কৌশলটা না জানলে যত ছোট ম্যাজিকই হোক না কেন, সবাই অবাক হবেন। তোমরা একটু অভ্যাস করে দেখিও, দেখবে সবাই কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছে।

প্রথম থেকে লিখছি। টেবিলের ওপর তিনটে কোকাকোলার ছিপি আর একটা পয়সা রয়েছে। ছিপি তিনটে একদম সাধারণ। কোন কৌশল নেই তাতে। আর পয়সাটা ধরো একটা সাধারণ পয়সা। জাদুকর দর্শককে বললেন, ঐ পয়সাটাকে তিনটে ছিপির যে-কোন একটা দিয়ে চাপা দিতে। জাদুকর ছিপিগুলো ছোঁবেন না, কিন্তু দূর থেকেই তিনি বলে দেবেন কোন্ ছিপির তলায় পয়সাটা রয়েছে। একথা বলার পর জাদুকর মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। একজন দর্শক পয়সাটাকে একটা ছিপি দিয়ে চাপ দিয়ে তিনটে ছিপিই একটু নড়িয়ে চড়িয়ে রাখলেন। এবার জাদুকর ছিপি তিনটের কাছে এসে দূর থেকে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। আর তারপর গন্ধ শুঁকেই বলে দিলেন কোন্ ছিপির তলায় পয়সাটা রয়েছে। সবাই তো অবাক!

এবার তোমাদের কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ ঐ ছিপিগুলোর মধ্যে বোধহয় কোন ফুটো-টুটো করা ছিল। মোটেই কিন্তু তা নয়। আগেই বলেছি ছিপিগুলো একদম সাধারণ। আসল কৌশলটা করা ছিল পয়সাটার মধ্যে। পয়সাটাও একদম সাধারণ পয়সা, তবে তার মধ্যে একটা কারসাজি করা ছিল। একটা ছোট্ট চুল, ধর এক ইঞ্চি লম্বা ঐ পয়সাটাতে আঠা দিয়ে লাগান ছিল। পয়সাটাকে ছিপি দিয়ে চাপা দিলেও ঐ চুলটা কিন্তু বেরিয়ে থাকবে। টেবিলের ওপরকার কাপড়টা রঙচঙে তাই চুলটা কারুরই চোখে পড়বে না। এখন গন্ধ শোঁকার অছিলায় খালি দেখে নিতে হবে কোন ছিপির তলা থেকে একটু চুল বেরিয়ে আছে।

এ খেলাটা বেশিবার করা উচিত নয়, কারণ তাহলে দর্শকের চোখে চুলটা ধরা পড়ে যেতে পারে। তবে নিশ্চিন্তভাবে একবার দেখানো চলে। সবার ধারণা হবে ছিপিগুলোর মধ্যে কোন কৌশল আছে। আর সেজন্য পয়সার সাথে লাগানো ঐ চুলটাতে নজরই দেবেন না। সব অবশ্য নির্ভর করছে তুমি কিভাবে দেখাচ্ছ, তার ওপরে।

থট রিডিং

এ ম্যাজিকটার জন্য চাই একটা বড় কৌটো অথবা কাপড়ের ব্যাগ এবং এক প্যাকেট তাস। জাদুকর কুড়ি-পঁচিশখানা তাস হাতে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দর্শকের হাতে দিয়ে বললেন—"এ তাসগুলো ভাল করে মিশিয়ে দিন আর সেখান থেকে যে-কোন একটা তাস মনে মনে পছন্দ করুন, কিন্তু আমাকে বলবেন না কোন্ তাসটা পছন্দ করেছেন। তারপর তাসগুলো আবার ভালভাবে মিশিয়ে ফেরত দিন।" দর্শক তাই করলেন। জাদুকর এবার সে তাসগুলো নিয়ে একটা ব্যাগ বা কৌটোর ভেতরে রেখে একটা কিছু করলেন। তারপর কৌটো বা ব্যাগটাকে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে তাসগুলো সব বের করে আনলেন। এখন তিনি দর্শককে জিজ্ঞেস করলেন কোন্ তাসটা পছন্দ করেছেন? ধরা যাক তিনি বললেন, 'ইস্কাবনের টেক্কা'।

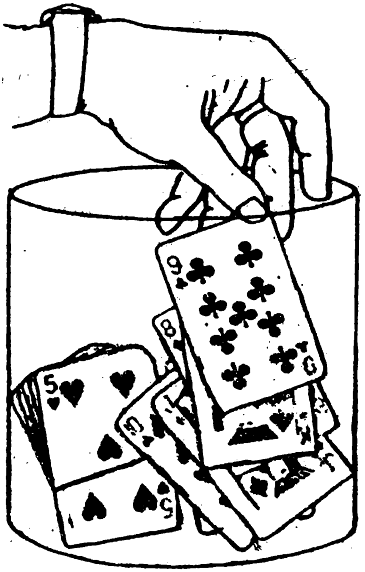

জাদুকর এবার তাসগুলো সব মেলে ধরলেন তাঁর সামনে। অবাক কাণ্ড! তাঁর মনোনীত ঐ তাসটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবাই তো অবাক। দর্শকদের অনুরোধে জাদুকর ম্যাজিকটা আবার দেখালেন— সেই একই পদ্ধতি এবং একই ঘটনা। দর্শকদের মনোনীত তাসটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আগের সেই ইস্কাবনের টেক্কাটা আবার সেখানে ফেরত এসে গেছে।

তোমরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ। ভাবছ জাদুকর কি করে সে তাসটা জানতে পারছেন এবং অদৃশ্য করছেন। ব্যাপারট কিন্তু আসলে খুব সহজ। এক প্যাকেট তাস থেকে জোকার বাদ দিলে বাহান্নখানা তাস থাকে, সবকটা তাসই আলাদা আলাদা। বাহান্নখানা তাস থেকে অর্ধেকটা আগের থেকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকিয়ে ঐ ব্যাগ বা কৌটোর ভেতরে গোপনে রেখে দেয়া ছিল। আর বাকি তাসগুলো দিয়ে জাদুকর ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন। এ অংশে যে তাসগুলো রয়েছে, তার একটাও অন্য অংশে নেই। দর্শকরা এ দ্বিতীয় অংশ থেকে একটা তাস যখন পছন্দ করে পুরোটা ভাল করে মিশিয়ে জাদুকরকে ফেরত দিলেন তখন সে তাসটা কী, সেটা তাঁর জানার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি করলেন কী, তাসগুলো নিয়ে সেই ব্যাগ বা কৌটোর ভেতরে রেখে আগের থেকে রাখা তাসের প্যাকেটের অংশটাকে বের করে নিয়ে এলেন। প্রথম অংশে রাবার ব্যাড়টা দিয়ে দ্বিতীয় অংশের তাসগুলোকে আটকে দেয়া হয়েছিল। দর্শকরা কিন্তু এসব ব্যাপারের কিছুই জানবেন না। ম্যাজিকটা অটোমেটিক ঘটবে। তাঁরা কোন্ তাস পছন্দ করেছিলেন তা জানার মোটেই দরকার নেই। কারণ প্রথম অংশটাকে দর্শকদের সামনে মেলে ধরলে কোন মতেই দর্শকদের সেই মনোনীত তাসটা দ্বিতীয় অংশের মধ্যে থাকতে পারে না। আর দর্শকেরা ভাবলেন জাদুকর ম্যাজিক করে তাদের মনোনীত তাসটা কী তা জানতে পেরেছেন এবং সেটাকে সরিয়ে রেখেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

অন্য আর এক পদ্ধতিতে থট রিডিং-এর ম্যাজিক শিখিয়ে দিচ্ছি। এর চমকটাও মোটামুটি একরকম কিন্তু কৌশলটা আলাদা। এর জন্য বড় কৌটো বা কাপড়ের ব্যাগ, কিছুরই প্রয়োজন নেই। যাই হোক, প্রথম থেকেই বর্ণনা করছি।

জাদুকর এক প্যাকেট তাস নিয়ে টেবিলে বিছিয়ে দিলেন। তাসগুলো সব সোজাভাবে রয়েছে—অর্থাৎ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, কোথায় কি তাস রয়েছে। এবার জাদুকর দর্শককে বললেন—ঐ মেলে ধরা তাসগুলো থেকে যে কোনও একটা তাস মনে মনে পছন্দ করতে। তবে যে তাসটা তিনি পছন্দ করবেন—তা যেন জাদুকরকে গুছিয়ে একত্রিত করে বাঁ হাতের মুঠোয় ধরে হাতটা পেছনে নিয়ে গেলেন, আর তারপর ডান হাতটাও পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন একটা করলেন— এবং বললেন, "আপনারা মনে মনে পছন্দ করা তাসটাকে আমি খুঁজছি। পেলেই ওটাকে আমি ভ্যানিশ করে দেব।" বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ বললেন, "এই তো পেয়েছি, খুব দুষ্টুমি করে লুকিয়ে ছিল। যাবে কোথায় তুমি…এই নাও তোমায় ভ্যানিশ করে দিলাম! ছুঃ!" তারপর তাসগুলো সামনে এনে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখবেন। কি অবাক ব্যাপার! সেই মনে মনে পছন্দ করা তাসটা ওখানে নেই!! দর্শক কোন্ তাস পছন্দ করেছিলেন— সেটা জাদুকর জানলেন কীভাবে?! ওটা ভ্যানিশই বা হলো কিভাবে….সবাই খুব তাক খেয়ে যাবেন।

থট রিডিং মোটেই নয়। এটা পুরোপুরিই বুদ্ধির খেলা। এর জন্য একটা মজার প্রস্তুতি নাও। এক প্যাকেট তাস নিয়ে তার থেকে জোকার দুটো বাদ

দিয়ে তাসগুলো সব খুব ভাল করে মিশিয়ে নাও। সব যেন এলোমেলো হয়ে মিশে যায়। এভাবে চার-পাঁচ বার এলোমেলো করে মেশাবার পর ওর থেকে ছাব্বিশটা তাস নিয়ে বাকি ছাব্বিশটা তাসের পেছনে পিঠোপিঠিভা খুব ভাল করে আঠা দিয়ে সেটে দাও। শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেলেই ব্যাস- তোমার ম্যাজিকের সরঞ্জাম তৈরি! তাসগুলোকে মেলে ধরলে এপাশে যা দেখা যাচ্ছে উল্টো পিঠে তার একটাও তো নেই। দর্শক তো আর এই আ লাগানো ব্যাপারটা জানে না। সে এই তাসগুলোর মধ্যে যা-ই পছন্দ কর না কেন তুমি সবকটা তাস হাতে করে পেছনে নিয়ে উল্টে দিলেই, ঐ উল্টো পিঠের তাসে দর্শকের মনোনীত তাসটা থাকতেই পারে না। অর্থ পেছনে নিয়ে গিয়ে উল্টে—ঐ উল্টো দিকের তাসগুলোকেই মেলে ধর হবে। ঝটপট না করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নাটক করে দেখালে দর্শ দেখবেন তাঁর তাসটাই নেই। পুরো ছাব্বিশটা তাসই যে পাল্টে গেছে সে খেয়ালও করবে না। চেষ্টা করে দেখ, খুব সহজ তো বটেই, দুর্দান্ত মজার ম্যাজিক এটা।

ভি আই পি-র ম্যাজিক

এ ম্যাজিকটাকে একটা সাধারণ গতানুগতিক ম্যাজিক ,বলে ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে। এটা আসলে একটা বুদ্ধির খেলা। ম্যাজিকের মধ্যে দুটো ভাগ আছে। প্রথমটা হচ্ছে বাস্তবিকভাবে জাদুকর কি করলেন বা দেখালেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দর্শকদের মনে কি ধারণা বা প্রতিক্রিয়া হল। আমরা জাদুকররা ঐ দ্বিতীয় অংশটাকে বেশি প্রাধান্য দিই বা বেশি দরকারী বলে মনে করি। স্টেজের মধ্যে দর্শকদের সামনে কি কৌশল অবলম্বন করে কোন খেলা দেখালাম, সেটা নিশ্চয়ই দরকারী, কিন্তু তার থেকেও দরকারী হচ্ছে সেই খেলা দেখার পর দর্শকের মনে কতটা জাদু প্রতিক্রিয়া তৈরি হল। এ কারণেই আমি সর্বত্র বলি, ম্যাজিক কখনও জাদুকরের হাতে তৈরি হয় না, ম্যাজিক ঘটে দর্শকদের মনের ভেতর।

এখন যে ম্যাজিকটা শেখাচ্ছি, তার কৌশলটা নিশ্চয়ই খুব সহজ। এত সহজ যে জানামাত্রই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা কি জমবে? কিন্তু মনে রেখো, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি ঃ এটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটানো ম্যাজিকের এক দুর্দান্ত নিদর্শন এবং এ খেলাটা দেখার পর দর্শকের মনে জাদু-প্রতিক্রিয়া খুব জোরালো হয়।

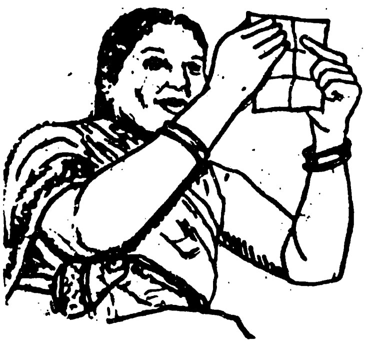

প্রথম থেকে শুরু করছি। জাদুকর সবার সামনে একটা কাগজের টুকরোর মধ্যে একটা কিছু লিখলেন। তারপর সে কাগজটা ভাঁজ করে দর্শকদের মধ্যে সব থেকে সম্মানীয় একজন কাউকে বেছে নিলেন। তাঁর হাতে সে কাগজটা দিয়ে বললেন, "দয়া করে এটা এখন খুলবেন না। আমি যখন বলব তখন খুলে পড়বেন। যা লেখা আছে শুধু সেটাই পড়বেন এবং আমার অনুরোধ, সে সম্পর্কে কিছু বাড়িয়ে বলবেন না বা কমিয়েও বলবেন না। আমাকে টেনে সাহায্যও করবেন না, শুধু সত্যিটুকু অর্থাৎ যা লেখা আছে সেটাই প্রকাশ করবেন। আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি, সেজন্য আপনার সঠিক সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি আপনি সহযোগিতা করবেন।" সেই সম্মানিত দর্শক কাগজটা হাতে নিয়ে রইলেন।

এবার জাদুকর অন্যান্যদের বললেন, "এখন আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এক ম্যাজিক দেখাবো। ঐ কাগজের মধ্যে আমি আগের থেকেই একটা কিছু লিখে রেখেছি। কি লিখেছি আপনারা জানেন না। কিন্তু যাই লিখি না কেন আমি জানি সেটা আপনাদের খুব অবাক করে দেবে। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন এক থেকে দশ হাজারের মধ্যে যে কোন একটা সংখ্যা বলুন, আমি আগের থেকেই জানি আপনারা কি বলবেন আর সে অনুযায়ী সংখ্যাটা আমি ঐ কাগজে লিখে রেখেছি। " দর্শকদের মধ্য থেকে ধরা যাক একজন বললেন, "ছ হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ। " জাদুকর বললেন, "আপনারা কি এ সংখ্যাটিই ঠিক করলেন? যদি আপনারা পরিবর্ত্তন করতে চান তাহলে এখনও পরিবর্তন করতে পারেন। " দর্শকরা বললেন, "না আমরা ঐ সংখ্যাটিই ঠিক করেছি। " জাদুকর বললেন, "আমি জানতাম আপনারা ঐ ছ হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ-ই বলবেন আর সে অনুযায়ী আমি ঐ কাগজে লিখে রেখেছি। " জাদুকর এবার সেই সম্মানিত দর্শককে বললেন, "আপনি তো শুনলেন ওঁরা কি সংখ্যা পছন্দ করেছেন,

এবার আপনি কাগজটা খুলে পড়ে বাকি সবাইকে বলুন, নম্বরটা ঠিক আছে কি না। " সেই সম্মনিত দর্শক কাগজটাকে খুললেন এবং পড়ে অবাক হয়ে হেসে বললেন, "ঠিক আছে। "

তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ, এটা কি করে সম্ভব? এক থেকে দশ হাজারের মধ্যে দর্শকরা কোন্ সংখ্যা বেছে নেবেন তা জাদুকর জানবেন কি করে? নিশ্চয়ই দর্শকের মধ্যে জাদুকরের নিজের লোক আছে। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। আসল কৌশল রয়েছে ঐ কাগজটার মধ্যে। দর্শকরা কি সংখ্যা বললেন সেটা মোটেই দরকারী নয়, তাঁরা যে-কোন সংখ্যাই বলতে পারেন। জাদুকর ঐ কাগজের মধ্যে কোন সংখ্যাই লেখেননি, শুধু লিখেছিলেন, "ঠিক আছে। "

শর্ত অনুযায়ী সেই সম্মানিত দর্শক কাগজের লেখাটা পড়ে যখন বললেন, "ঠিক আছে" তখন দর্শকরা ভাবলেন ঐ সংখ্যাটিই বোধহয় লেখা আছে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, খেলাটা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কাগজের টুকরোটা গল্পের ছলে ছিড়ে ফেলবে, তা না হলে বাকি সবাই কিন্তু দেখতে চাইবেন। ওদিকে সেই সম্মানিত ভদ্রলোককেও দেখবেন তোমার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন না। শুধু মুচকে মুচকে হাসছেন। তোমার চালাকীর তারিফ করছেন। পরে সবার আড়ালে ওনাকে ধন্যবাদ জানিও।

সঠিকভাবে স্মার্টলি দেখিও, দেখবে সবাই খুব অবাক হয়ে গেছেন।

পরীক্ষায় পাসের ম্যাজিক

স্কুলের বন্ধুদের কাছে আমি ছিলাম সত্যিকারের হিরো। ওরা প্রায়ই আমাকে উসকানি দিয়ে বলত, "এই প্রদীপ, ম্যাজিক কর না পরীক্ষার খাতায়।" ওদের ধারণা ছিল, আমি সব পারি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? মোটেই না। তবুও হিরোইজন বজায় রাখতে ওদের ঐ ধারণাটা ভাঙতে আমার মোটেই ইচ্ছে হত না। বরঞ্চ নানারকম গপ্প বলে আর কৃতিত্ব ফলিয়ে সেটা বজায় রাখতাম। বাহাদুরি করে বলতাম, "ইচ্ছে করলেই করা যায়—কিন্তু টিচারদের ঠকিয়ে লাভ কী বল্?" এভাবে দিনগুলো বেশ কাটছিল, কিন্তু একবার এক মহা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলাম। নকল করার অভিযোগে বিতাড়িত অন্য এক স্কুলের ছেলে কি করে জানি না আমাদের স্কুলে এসে আশ্রয় পেল। তাও কিনা এসে ঢুকেছে আমাদের ক্লাসে। সে নাকি আগের স্কুলের হিরো ছিল। আমাদের স্কুলে এসেই আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করল।

একদিন তো বলেই বসল, "ম্যাজিক না ছাই! ম্যাজিক দিয়ে কি পরীক্ষায় পাস করা যায়? আসল কৌশল হচ্ছে ম্যাজিক নয় টোকনোলজি—অর্থাৎ টোকাটুকি করা।"

কথাটা শুনে খুব অপমানিত বোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, "টুকলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু ম্যাজিক করে পাস করলে কেউ বুঝতেই পারবে না। বুঝলেও কেউ রাগ করবেন না বরং মজা পাবেন। আমি ইচ্ছে করলেই করতে পারি, কিন্তু করি না।" কথাটার শেষ অংশ বলতে অবশ্য আমাকে একবার ঢোঁক গিলতে হয়েছিল।

ছেলেটা সবার সামনে চ্যালেঞ্জ করে বসল। 'তাড়িয়ে দেয়া' কথাটায় ওর আঁতে ঘা দিয়েছে। বলল, আমায় প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে ম্যাজিক দিয়ে পাস করা সম্ভব।

আমিও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। বললাম, ঠিক আছে, প্রমাণ করে দেখাব, তবে পরীক্ষার হলে নয়, এখানে।" সেও নাছোড়বান্দা। বললো, "ঠিক আছে, তাই সই, এক্ষুণি।"

এতটা ফাঁপরে পড়ব আমি ভাবিনি। চ্যালেঞ্জ তো গ্রহণ করলাম, কিন্তু এখন কি করা যায়? হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললাম, "ঠিক আছে, উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি। মনে করো, পরীক্ষার খাতাটা একদম সাদা জমা দিলাম। আর তারপর কোয়েশ্চেন পেপারটা পরীক্ষার পর বাড়ি আনলাম এবং বাড়িতে বসে নিজে ধীরে সুস্থে, প্রাণভরে আপনমনে লিখতে আরম্ভ করলাম। আমার বাড়িতে লেখা জিনিসটা যদি ম্যাজিক করে আপনা-আপনি স্কুলের ঐ খাতায় ফুটে ওঠে, তাহলে কি ব্যাপারটা খারাপ হয়?" আমার অন্যান্য বন্ধুদের চোখ চকচকিয়ে উঠল। ওরা বরাবরই আমার অনুরক্ত । কিন্তু এই নতুন ছেলেটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, "হেঃ বাড়িতে বসে উনি লিখবেন, আর সেটা পরীক্ষার খাতায় ম্যাজিক করে লেখা হয়ে যাবে। মিথ্যে কথা বলার একটা লিমিট আছে। প্রমাণ করে দেখাতে পারবি?"

এটুকুর অপেক্ষায় আমি ছিলাম, বললাম, "ঠিক আছে, প্রমাণ করছি। কিন্তু সংক্ষেপে। আমাকে একটা চক দাও।" সে কোত্থেকে খুঁজেপেতে একটা চক নিয়ে এল। চকটা হাতে নিয়ে বললাম, "মনে করো আমার এই বাঁ হাতের পাতাটা হচ্ছে পরীক্ষার খাতার পাতা। এতে কোন চকের দাগ নেই—একদম পরিষ্কার খাতাই আমি জমা দিলাম।" এই বলে আমি বাঁ হাতটাকে টেবিলের তলায় নিয়ে গেলাম। এবার ডান হাতে চক নিয়ে টেবিলের ওপর একটা ফুটকি দিয়ে বললাম, "বাড়ি ফিরে মনে করো এই আমি আমার মনের মতো করে লিখলাম। দেখো, ফলটা কি দাঁড়ালো।" বলেই আমি আমার বাঁ হাতটা টেবিলের তলা থেকে ওদের সামনে আনলাম। অবাক কান্ড, বাঁ হাতের পাতায় একটা চকের দাগ পড়ে গেছে। হাতের পাতাটাকে রুমাল দিয়ে ভালভাবে মুছে আমি আবার টেবিলের

তলায় হাত রেখে টেবিলের ওপর দুটো পাশাপাশি ফুটকি দিলাম। বাঁ হাতটা ওপরে আনতেই দেখা গেল— পরিষ্কার দুটো দাগ পড়েছে হাতের পাতায়। ছেলেটা ভাবল, নিশ্চয়ই টেবিলের তলায় আর একটা চক লুকনো আছে। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের তলাটা পরীক্ষা করতে লাগল। চক তো দূরের কথা, চকের দাগও নেই সেখানে।

সবাই দারুণ মুগ্ধ। তোমরাও নিশ্চয় ভাবছ, সত্যিই তো, কি করে হল! এটা জানলে পরীক্ষায় আর কোন চিন্তা নেই। বাড়িতে বসেই পাস। কি মজা। কিন্তু মনে রেখো এ ম্যাজিকের সঙ্গে পরীক্ষার খাতার কোন যোগাযোগই নেই। পরীক্ষায় এটা কোন কাজেই লাগবে না। এটা একটা মজার ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি করেছিলাম কী, সবার অলক্ষ্যে বাঁ হাতের আঙুলের নির্দেশক আর মধ্যম আঙুলের নখে ভাল করে চক ঘষে রেখেছিলাম। বাঁ হাতের পাতাটা মেলে ধরে ওপরের দিকটা দেখালে উল্টো পিঠে নখের ওই চকের দাগ

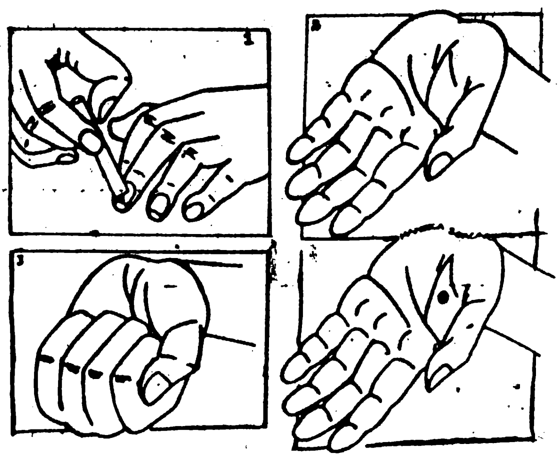

কারোরই চোখে পড়বে না। আমি ঐ সামনের দিকটাই ভাল করে মুছে বাঁ হাত টেবিলের তলায় নিয়ে গিয়ে শুধু আঙুল ভাঁজ করে মুঠোর মতো শক্ত করেছিলাম। চকের ছাপ হাতের পাতায় এসে পড়ল। টেবিলের ওপর যখন একটা ফুটকি দিয়েছিলাম, তখন একটা আঙুল ভাঁজ করেছিলাম। যখন দুটো ফুটকি দিয়েছিলাম তখন দুটো আঙুল ভাঁজ করেছিলাম। তোমরা চেষ্টা করে দেখ, এভাবে আঙুল ভাঁজ করলে নখের থেকে চকের দাগ হাতের পাতায় গিয়ে লাগবে। বাঁ হাত আবার টেবিলের ওপর আনাবার আগে মুঠো খুলে হাতের পাতা মেলে ফেলতে হবে। টেবিলের ওপর যে ফুটকি দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগই নেই। নখের দাগের কথা তো আর কেউ জানত না। আমার কথা অনুযায়ী সবাই ভেবেছিল, টেবিলের চকের দাগটাই বোধহয় ম্যাজিক করে হাতের পাতায় চলে যাচ্ছে। তোমরা একটু অভ্যাস করে বন্ধু-বান্ধবদের দেখিও। দেখবে সবাই কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ভাল কথা। স্কুলের সেই বন্ধুটি পরে একদম অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। আমাকে বেশ সমীহ করেই চলত। ম্যাজিকের গুণ নিশ্চয়ই। তাই নয় কি?

ভবিষ্যৎ বাণী (দুই)

ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম বা লন্ডন সাউথহল অঞ্চলের কয়েকটা জায়গা দেখলে মনে হয় যেন ভারতেই ফিরে এসেছি। ভারতীয়রা সেখানে গিজগিজ করছে। আমার বন্ধু-বান্ধব অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ শিক্ষার্থে এখানে এসেছে। আর সেজন্য রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ 'অ্যাই প্রদীপ' হাঁকটা প্রায়ই শুনতে হয়।

হোটেলের নীচে রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিলাম। সদলবলে প্লেটের খাবার পেটে পুরে অদৃশ্য করছি; ঠিক সে সময়ে কানে এলো ঐ পরিচিত আওয়াজ, "অ্যাই প্রদীপ।" পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার স্কুলেপড়া বন্ধু দীনেশ রায়, সঙ্গে আরও অনেক লোকজন। দীনেশের সঙ্গে সেই কবে শেষ দেখা, কত বছর আগে হঠাৎ ও কেমন যেন উবে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে দেখা হওয়াতে খুব মজা লাগছিল। জানলাম, ও বহু বছর বিলেতে আছে এবং ডাক্তার হয়েছে। দীনেশ রায় এখন "ডক্টর ড্যানিশ রে" হিসেবে খুব সুনাম করেছে। এ হোটেলে ওদের কি একটা সেমিনার হচ্ছে সেজন্য বিভিন্ন দেশের ডাক্তারবাবুরা এসে জমায়েত হয়েছেন।

অনেক গল্প-গুজবের পর শুরু হল আসল ব্যাপার। সবাই মিলে ধরে বসল—ম্যাজিক দেখাতে হবে। আমি জানতাম, ম্যাজিকের পর্ব আসবেই। সেজন্য মনে মনে প্রস্তুতও ছিলাম। বললাম, "এখানকার রয়্যালটি থিয়েটারে আমার শো হচ্ছে, চলে এসো সবাই একদিন।" তারাও এককাঠি উপরে। একজন বললেন, "সে তো দেখবই, কিন্তু এখন একটা চাই।" আমি বুঝলাম, কোনও উপায় নেই, দেখাতেই হবে। পকেট থেকে ডায়েরিটা বার

করে নিয়ে বললাম, "আমায় একটু হিসেব করতে হবে। হিসেবটা সেরে নিই তারপর দেখাচ্ছি।" ডায়েরিটা বার করে আমি আমার কাজ সেরে নিলাম।

একটু পরে ডায়েরি আর কলমটা দীনেশের হাতে দিয়ে চার রাশির যে কোনও একটা সংখ্যা লিখতে বললাম। আর তারপর বললাম, সে যেন অন্য কাউকে সংখ্যাটা না বলে। সবার আড়ালে সেই ডায়েরিতে তার মনের মতো একটা সংখ্যা লিখল। তারপর দ্বিতীয়জনকে একইভাবে আর একটা সংখ্যা সেই আগের সংখ্যাটার তলায় লিখতে বললাম। তার লেখা হয়ে গেলে তৃতীয়জনকে লিখতে দিলাম, তারপর চতুর্থজনকে। এভাবে চারজন মিলে পর পর চারটে সংখ্যা লিখলেন। এ সংখ্যা চারটিকে এবার আমি পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ব্যক্তির কাছে দিয়ে বললাম, "এগুলো যোগ করলেন কত হয় বলুন।" তিনি যোগ করে যোগফলটা বললেন। আমি তখন ডায়েরির ঠিক শেষ পাতাটা উল্টিয়ে দেখালাম—আগের থেকেই সেখানে যোগফলটা লেখা রয়েছে। সবাই অবাক, আমি আগের থেকে তাঁদের সংখ্যার যোগফল জানলাম কি করে?

এ ম্যাজিকটার কৌশল কিন্তু ভীষণ সহজ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। আমি সবার আগে যখন হিসেব করছিলাম তখন ডায়েরির একটা পাতায় ইচ্ছেমতো চার রাশির চারটি সংখ্যা পর পর লিখে রেখেছিলাম। ধরো লিখেছিলাম

1	5	2	9
4	6	5	7
6	0	3	8
2	2	4	1

এ সংখ্যাগুলো লেখার পর সেগুলোর যোগফলটাকে অর্থাৎ 14465 এ সংখ্যাটাকে ডায়েরির শেষ পাতায় লিখে রেখেছিলাম। ব্যস, এই ছিল আমার প্রস্তুতি।

প্রথম চারজন যখন তাদের ইচ্ছেমতো সংখ্যা লিখতে এল, তখন আমি ডায়েরির অন্য একটা পাতা মেলে দিয়েছিলাম। তাদের লেখা হয়ে যাওয়ার পর পঞ্চমজনকে যখন যোগ করতে দিয়েছিলাম তখন ডায়েরির পাতা উল্টিয়ে যে পাতায় আমি আগের থেকে সংখ্যা চারটি লিখে রেখেছিলাম সে পাতাটাকে মেলে আমার লেখা নম্বর চারটিকে যোগ করতে দিয়েছিলাম। পঞ্চমজন তো আর জানেন না আগের চারজন কি কি সংখ্যা লিখেছেন এবং এগুলো বেমালুম অন্য সংখ্যা। সেজন্য নিঃসন্দেহে সে আমার লেখা সংখ্যাগুলোই যোগ করতে আরম্ভ করল। এর যোগফল তো ডায়েরির পেছনে আগের থেকে লেখাই আছে। সুতরাং সবাইকে অবাক করতে আর কিছুই দরকার নেই। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।

তোমরা যখন খেলাটা দেখাবে তখন চেষ্টা কর বেশি সংখ্যক দর্শকের সামনে দেখাতে। সে সঙ্গে খেয়াল রেখো, যাঁরা সংখ্যা লিখবেন, তাঁরা যেন একটু দূরে দূরে থাকেন। তাহলে অন্যজনের সংখ্যা জানতেই পারবেন না এবং ডায়েরির পাতাটা ওল্টাতেও তোমার সুবিধে হবে।

ম্যাজিক রিং

এখন তোমাদের যে ম্যাজিকটা শেখাচ্ছি, সেটা ম্যাজিক জগতের একটা বিখ্যাত খেলা। অনেকে বলেন, চীনারা নাকি প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিলেন। অনেকের মতে, ভারতীয়রা। আবার আজকাল একদল লোক বলছেন, এটা নাকি বিলাতি খেলা। যেখানকার ম্যাজিকই হোক না কেন স্বীকার করছি এটা আমার খুব ভাল লাগে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন বাবা আমায় এটা শিখিয়েছিলেন এবং প্রায়ই এটাকে আমি বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে অবাক করে দিতাম।

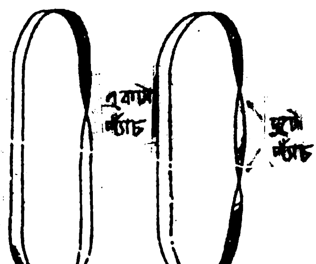

প্রথম থেকেই বলছি। জাদুকরের হাতে একটা সাধারণ কাগজের ফালির তৈরি বড় একটা রিং রয়েছে আর অন্য হাতে রয়েছে একটা কাঁচি। জাদুকর এবার সে কাগজের মাঝ বরাবর লম্বাদিক ধরে কাঁচি দিয়ে কাটতে

শুরু করলেন। (ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।) সবাই আন্দাজ করতে পারছ, কাটা শেষ হলে দুখানা রিং হয়ে যাবে। কিন্তু, কী আশ্চর্য সম্পূর্ণ গোলভাবে যেই কাটা হল তখন দুটো রিং কিন্তু তৈরি হল না। তার বদলে একটা বড় রিং হয়ে গেল। জাদুকর আবার আর একটা রিং নিয়ে ঠিক একইভাবে কাটতে আরম্ভ করলেন। এবার দুটো রিং হয়ে গেল, কিন্তু অবাক কান্ড, রিং দুটো আলাদা নয়, একটার সঙ্গে আর একটা ঠিক চেনের মতো আটকে রইল। একইরকম আর একটা রিং দর্শকদের একজনকে কাটতে দেয়া হল। কিন্তু কোনও ম্যাজিকই তাতে হল না। সাধারণত যা হওয়া উচিত ঠিক তা-ই হল। অর্থাৎ দুটো রিং একদম আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হল।

তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছ আর ভাবছ কি করে এটা সম্ভব হল! আসলে রিং দুটো তৈরি করার মধ্যেই রয়েছে এর আসল কৌশল। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও ওগুলো কিন্তু মোটেই সাধারণভাবে তৈরি ছিল না। তোমরা এ বিশেষ রিং খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পার। দু ইঞ্চি চওড়া আর দু গজ লম্বা একটা কাগজের ফালি নাও। এত লম্বা সাদা কাগজ যদি না পাও, তাহলে একটা খবরের কাগজ মেলে ধরে সরু করে কেটে নিতে পারো। এই কাগজের ফালির দুমাথা আঠা দিয়ে আটকালেই রিং তৈরি হয়ে যাবে। সে না হয় হল, কিন্তু এর কৌশল হিসেবে করতে হবে কি, কাগজের ফালির মাথা দুটো আঠা দিয়ে লাগাবার সময় স্বাভাবিকভাবে সোজাসুজি না লাগিয়ে একটা প্যাঁচ খাইয়ে ঘুরিয়ে আটকে দাও। কি বলতে চাইছি ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। অত বড় রিংয়ের মধ্যে এ প্যাঁচটা কেউ খেয়ালই করবে না। তাহলেই তোমার প্রথম ম্যাজিকটা অর্থাৎ একটা রিং দুটো না হয়ে কিভাবে একটা বড় রিং হয়ে যায় তার কৌশল তৈরি হয়ে গেল। এবার কাগজের ফালির মাঝ বরাবর কেটে দেখ, দেখবে তুমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছ।

এবার দ্বিতীয় ম্যাজিকটা। এটাও ঠিক আগের মতোই। তবে এবার ফালিটাকে এক প্যাঁচ না খাইয়ে দু-প্যাঁচ খাওয়াও। দেখবে, দুটো রিং তৈরি হয়ে কেমন চেনের মতো আটকে আছে। আর ওদিকে দর্শককে যে তৃতীয় রিংটা দেয়া হয়েছিল তাতে কোন প্যাঁচই ছিল না। একদম সাধারণ রিং। সুতরাং ওতে কি কখনও ম্যাজিক হয়?

বিস্কুটের ম্যাজিক

আশুতোষ কলেজে যখন পড়তাম, তখন আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর সুনীল সিদ্ধান্তবাবুর বাড়িতে প্রায়ই দুর্দান্ত রকমের আসর বসত। লেখাপড়া থেকে শুরু করে গান-বাজনা, ম্যাজিক সবই হত সেখানে। স্যারের সাথে আমরা সিনেমায় যেতাম, হৈচৈ করতাম, আবার লেখাপড়ায় বসতাম। তার ফলে লেখাপড়া জিনিসটাকে কোনওদিনই ভীতিকর মনে হয়নি। ভালোয় ভালোয় সবাই পাস করেছি। এখন বুঝতে পারছি, এ সবই স্যারের ম্যাজিক। সিদ্ধান্তবাবু জানেন কিভাবে পড়াশোনা করিয়ে নিতে হয়। চিন্তা করে দেখ, বছরের বেশির ভাগ সময়ই আমি ম্যাজিক নিয়ে ব্যস্ত থাকি এবং বাইরে বাইরে কাটাই। পরীক্ষার হয়তো দু-এক মাস আগে বাড়ি ফিরতে পারলাম। ঐ দু-এক মাসের মধ্যেই তিনি আমায় ঠিক তৈরি করে দিতেন। গুরুদক্ষিণা হিসেবে তাঁর কাছে টাকা-পয়সার কোনও স্থানই ছিল না। আজকালকার দিনের বিভিন্ন কোচিং-এর 'বিদ্যাবেচা বেনিয়া'দের মতো নয়। ভালভাবে পাস করে দেখানোটাই ছিল দক্ষিণা। স্যারের কাছে এজন্য আমি চিরদিনের ঋণী।

স্যারের ছেলে আশিস আমাদের কাছে 'বাবু' নামে পরিচিত। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ বাবুর সঙ্গে দেখা। ও সেই আগের মতোই আছে, রাস্তার মধ্যেই ধরে বসল, "প্রদীপদা, একটা ম্যাজিক দেখাও।" অন্য কেউ হলে হয়তো আপত্তি করতাম; কিন্তু বাবুর বেলায় তার উপায় নেই। কারণ ও আসলে একটা পোকা—মানে ম্যাজিক-পোকা। না দেখে ছাড়বেই না। বললাম, "ঠিক আছে, কিসের ম্যাজিক বলো?" সে একটু ভেবে পকেট থেকে দুটো বিস্কুট বের করে বলল, "এগুলো দিয়ে।" আমি বেশ চমকে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি ও ঠিক করে ফেলবে, ভাবতেই পারিনি। মজা করার জন্য বললাম, "বিস্কুট তো খেয়ে ফেললেই ভ্যানিশ হয়ে যায়—এ আর কঠিন কী?" বাবু চিৎকার করে উঠল, "না, না, ওসব বাজে কথা নয়, ম্যাজিক চাই, খাঁটি ম্যাজিক।" স্যারের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাবু আমায় ম্যাজিক দেখাতে বললে আমি তো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম,

তখন ও ঠিক একই রকম ভাবে চিৎকার করত, আর তারপর আমার চুল-জামা-কাপড় ধরে টানাটানি করত। বিপদে পড়ে ম্যাজিক দেখাতেই হত। এবার বাবুকে সেরকম চিৎকার করতে দেখে বেশ ভয়ই পেয়ে গেলাম। রাস্তার মধ্যেই যদি চুল-জামা টানতে আরম্ভ করে? না বাবা, দরকার নেই কথা বাড়িয়ে। বললাম, "কি দেখতে চাও বলো।" সে বলল, "এগুলো ভেঙে জোড়া লাগিয়ে দাও।" আমি পড়লাম ফ্যাসাদে। কিভাবে সেটা করা যায়।

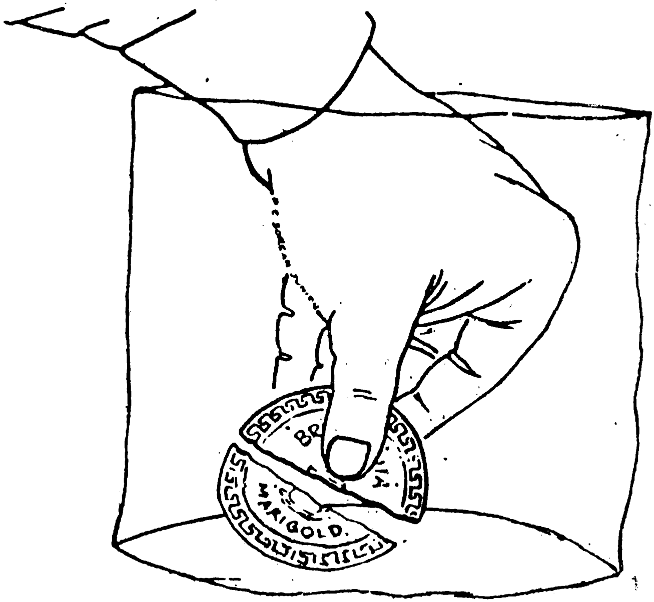

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললাম, "বিস্কুট দুটোকে একটা ঠোঙার মধ্যে ভেঙে অর্ধেকটা তোমাকে দেব আর বাকি অর্ধেকটা আমার কাছে থাকবে। তোমার টুকরোগুলো মুখে পুরে চিবোতে শুরু করবে, অমনি দেখবে আমার টুকরোগুলো জোড়া লেগে আস্ত হয়ে গেছে।"

একটা বড় ঠোঙাও জোগাড় হয়ে গেল। আমি একটা বিস্কুট সেই ঠোঙার মধ্যে রেখে আধখানা করে ভাঙলাম। এক টুকরো বাবুকে দিয়ে চিবোতে বললাম আর অন্য টুকরোটা ঠোঙার ভেতরই রইল। এবার আবার দ্বিতীয় বিস্কুটটাকে ঠোঙার ভেতর নিয়ে ঠিক আগের মতোই ভেঙে এক টুকরো আবার বাবুকে দিলাম। আমার কথামত বাবু সেগুলো চিবোতে আরম্ভ করল, আর চোখ রইল ঠোঙাটার ওপর যদি কোন কারসাজি করি।

ঠোঙাটার মুখ বন্ধ করে আমি ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম। একটু পরেই ঠোঙাটা খোলা হল। অবাক কান্ড, সেখানে ভাঙা বিস্কুট দুটো জোড়া লেগে আস্ত একটা বিস্কুট হয়ে গেছে। বাবু তো মুগ্ধ।

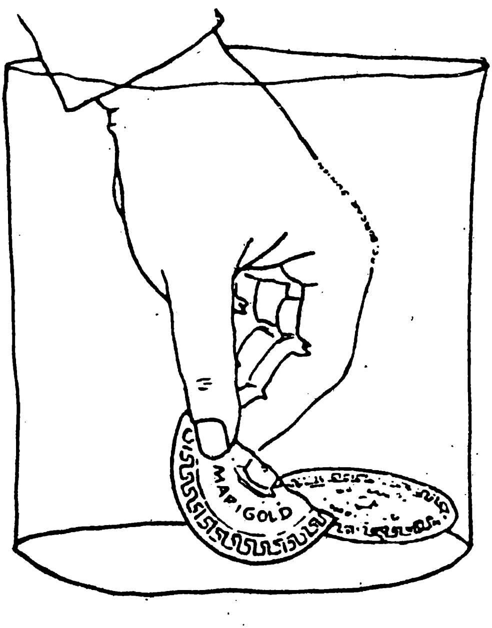

বিস্কুটটা কিভাবে জোড়া লেগেছিল, সেটা তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। ভীষণ সহজ এর কৌশল। প্রথম বিস্কুটটাকে ঠোঙায় পুরে আমি মাঝামাঝি

ায়গাতে ভেঙে সত্যি সত্যিই দু-টুকরো করেছিলাম এবং তার এক টুকরো বুকে খেতে বলেছিলাম। দ্বিতীয় বিস্কুটটাকে যখন ঠোঙায় ঢোকালাম তখন াটা না ভেঙে ভাঙবার অভিনয় করেছিলাম এবং ঐ প্রথম বিস্কুটের ভাঙা করোটা তুলে এনে বাবুকে দিয়েছিলাম। ঠোঙার ভেতরে ঐ দ্বিতীয় বিস্কুটটা াস্তই ছিল। বাইরে থেকে কেউই সেটা বুঝতে পারেনি। কৌশলটা আশা রি বুঝতে পেরেছ। তোমরা একটু অভ্যাস করে বন্ধু-বান্ধবদের দেখিও। ারাও খুব অবাক হয়ে যাবে।

পুনশ্চ ঃ সময় কিভাবে ম্যাজিকের মতো পাল্টায়। সেই ছোট্ট 'বাবু' খন এক বড় মাপের মানুষ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কেমিস্ট্রির ধ্যাপক। ওর কাছে এখন কত ছাত্র আসে পড়তে। দেখে আমার সেই ত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। প্রফেসর আশিস সিদ্ধান্ত যত বড়ই হোন না কন, আমার কাছে একদম একই রয়ে গেছে। এই তো সেদিন দেখা হলো, াখা হতেই বলল, "দাদা, একটা ম্যাজিক দেখাও না।" বুঝলাম, বাবু ামাদের বাবুই আছে।

অগ্নি পরীক্ষা

আফ্রিকা মানেই রোমাঞ্চকর ঘটনার দেশ। নানারকম ঘটনা-দুর্ঘটনা, হঠাৎ করে ঘটবার জন্য যেন আফ্রিকাতেই ঘাপটি মেরে বসে আছে। ছোটবেলা থেকে অনেক বই-এ পড়েছি, তাছাড়া বাবার কাছেও নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনেছি। সেজন্য আফ্রিকায় যাওয়ার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিল। যখন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমায় ইন্দ্রজাল দেখাবার আমন্ত্রণ পেলাম তখন মনে হচ্ছিল ছোটবেলার সেই কল্পনাগুলো যেন হঠাৎ ম্যাজিকের মতোই নতুন করে ঘটাতে চলেছি। নতুন নতুন অনেক মজার মজার ঘটনাও ঘটেছিল সেসব কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ জাগে।

আফ্রিকার জনসাধারণ ম্যাজিক জিনিসটাকে ভীষণ ভয় পান। আমার নাম এঁরা দিয়েছেন "বাওয়ানা মুচাবি" অর্থাৎ "মিঃ জাদুকর"। নানারকম কুসংস্কারকে ভিত্তি করে এবং স্থানীয় জংলী ওঝাদের কথা শুনে এদের ধারণা হয়েছে আমি নাকি একজন ভয়ঙ্কর মানুষ। 'ফুস্ মন্তর' করে দিয়েই আমি নাকি ওদের বোবা এবং অন্ধ করে দিতে পারি। আমি নাকি একবার একদল গুন্ডাকে মন্ত্রের জোরে ছাগল বানিয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া দেখে কম বয়স মনে হলেও আসলে আমি নাকি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমার বাবা বা ঠাকুর্দাই নাকি মন্ত্রবলে জওয়ান সেজে 'আমি' হয়ে রয়েছি।

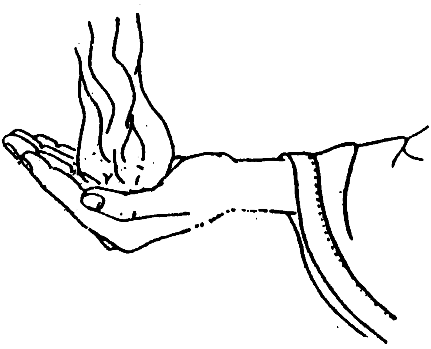

টানজানিয়ার আরুসা শহরে তখন পুরোদমে ইন্দ্রজাল চলছে। একদিন সকালে দেখি বাংলোর বাইরে একজন স্থানীয় অধিবাসী হাঁটু গেড়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর কি যেন বলছে। কাছে যেতেই সে মাটিতে আছড়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী?'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে যা বললো তাতে বুঝলাম—তাদের গ্রামে তার ছেলে মোবিতিকে আটকে রাখা হয়েছে—কারণ সে নাকি ভীষণ বোকা, কুঁড়ে এবং তাদের সমাজের কলঙ্ক। সে নাকি কাজের অযোগ্য এবং সবসময়েই কুঁড়ের মতো বইখাতা নিয়ে লেখাপড়া করে। গ্রামের ওঝা বলেছেন, লেখাপড়া করলে মাথা বিগড়ে যায় আর সমাজের বাকি সবাইকে সম্মান করে না। সুতরাং গুরুজনদের সম্মানহানি হওয়ার আগেই তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। না হলে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হবে।

মোবিতির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। জাতে মাসাই এবং কাজে মোরান বা যোদ্ধা। ওর খুব শখ লেখাপড়া শিখে শহরে এসে গাড়ি চালায়। ওর এক বন্ধু নাকি কেনিয়ার নাইরোবি শহরে থাকে এবং কোন এক কোম্পানিতে বেশ কয়েক বছর হল ড্রাইভারের কাজ করছে। ও সম্প্রতি সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কোম্পানির মালিক বলেছেন, চাকরির আবেদন পত্র ভালভাবে লিখতে পারলে এবং নাম সই করতে পারলে তিনি মোবিতিকেও একটা চাকরি দেবেন। কিন্তু গ্রামের ওঝার মতে, লেখাপড়া শেখা খুব খারাপ। লেখাপড়া করলে মানুষ ভগবানের প্রদত্ত ক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলে : সে আর শিকারে যায় না; খাবার-দাবার পাল্টে ফেলে আর শুধু তা নয়, অসুখ হোক বা না হোক, শহরে গিয়ে সাদা চামড়া ডাক্তারকে দিয়ে ছুঁচ ফুটিয়ে আসে—ওঝাকে সম্মানই করে না—ইত্যাদি। সুতরাং সমাজে আবার স্থান পেতে গেলে তাকে প্রথা অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আজ সন্ধেবেলায় আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে মোবিতিকে পরিশুদ্ধ করা হবে। হাজার কান্নাকাটিতেও ওঝার মন ভেজেনি। মোবিতি যদি আগুনের ছ্যাঁকা হজম করতে পারে তাহলে বুঝতে পারা যাবে সে এখনও ভাল আছে—লেখাপড়ার কুনজর এখনও তার ওপর ভালভাবে পড়েনি।

লোকটা নিজে মনে-প্রাণে ওঝাকে মানে। কিন্তু ছেলের সমূহ বিপদের জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে জানে আগুনের ছ্যাঁকায় ছেলে অসুস্থ হবেই। আর সেজন্যই সে আমার কাছে এসেছে। তার বক্তব্য আমাকে এমন একটা ওষুধ বাতলে দিতে হবে যাতে আগুনেও তার কোন ক্ষতি না হয়। আমার মাথায়

চট্ করে একটা বুদ্ধি এল। আমি এক শিশি ভর্তি তেল তার হাতে দিয়ে বললাম—এ তেলের কিছুটা তোমার ছেলের হাতের পাতায় ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিও। দেখবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ওঝা সন্তুষ্ট হবে—কিন্তু তোমার ছেলের কোনও ক্ষতি হবে না। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হল ব্যাপারটা সে ঠিক বিশ্বাস করছে না। আমি তখন সেই তেল কিছুটা তার হাতে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেটা—একটু পরে নিভে গেল। সে তো ভয়ে হিম। কিন্তু তার হাতের কিচ্ছু হয়নি দেখে প্রচন্ড অবাক এবং খুশিও। আমাকে বহুবার 'আসান্তে সায়ানা' অর্থাৎ ধন্যবাদ জানিয়ে শিশি নিয়ে চলে গেল।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছ—এটা অসম্ভব। তেলে আগুন ধরলে তো হাত পুড়ে যাবেই, তাই নয় কি? আসলে ঐ তেল জিনিসটা কোনও সাধারণ তেল ছিল না। ওটা ছিল এক বিশেষ কেমিক্যাল মিক্সচার। জাদুকর হিসেবে সব কিছুর জন্যই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ঐ মিক্সচার আমি সব সময়েই কিছুটা সঙ্গে রাখি—বিশেষ করে আফ্রিকার মতো এই রোমাঞ্চকর জায়গায় যখন তখন প্রয়োজন হতে পারে—সে কথা ভেবে। বিজ্ঞানের স্যারকে জিজ্ঞেস করে তোমরাও এ মিক্সচার তৈরি করে দেখতে পার কেমন ম্যাজিকের মতো কাজ করছে। এটা তৈরি করতে গেলে চাই কিছুটা কার্বন-ডাই-সালফাইড এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। যে কোনও কেমিস্ট-এর দোকানে অথবা ল্যাবরেটরিতে এগুলো পাওয়া যাবে। চার চামচ কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সাথে ছয় চামচ কার্বন-ডাই-সালফাইড মেশালেই ব্যস মিক্সচার তৈরি হয়ে গেল। এবার এ মিক্সচার হাতের পাতায় ঢেলে একটু আগুন দিলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে—হাতে মোটেই গরম লাগবে না। কিন্তু আগুন এমন দাউ দাউ করে জ্বলবে যে সবার সাথে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আবার বলছি, বিজ্ঞানের শিক্ষককে জিজ্ঞেস না করে ও তাঁর অনুমতি না নিয়ে এ খেলা দেখানো ঠিক নয়। কেননা, এর ফলে অন্য কিছুতে আগুন লেগে বিপদ ঘটতে পারে।

আফ্রিকার এ আগুনের ম্যাজিকের কথা চাপা ছিল না। 'বাওয়ানা মুচাবি' মোবিতিকে আগুনের ছ্যাঁকার হাত থেকে বাঁচিয়েছে—একথা অনেকেরই জানা হয়ে গেল। একবার তো সে গ্রামের ওঝা এসে হাজির। এসেছিল–আগুনের ঐ ঘটনা শুনে—আমায় জব্দ করতে। সে আবার আর এক ঘটনা। পরে বলবো সে গল্প।

'জলে'র ম্যাজিক

হংকং-এর লোকেদের একটা অদ্ভুত রীতি আছে, তারা খাবার-দাবারের পর কিছুতেই জল পরিবেশন করেন না। ওদের ধারণা, ভাল-মন্দ খাবারের পর জল খেলে খাওয়ার আনন্দটাই নাকি 'জল' হয়ে যায়।

চীনা খাবার খেতে আমরা প্রত্যেকেই ভালবাসি। সুতরাং হংকং-এ এসে অনুষ্ঠান করে খাটা-খাটুনির পর আমরা সবাই গোগ্রাসে অনেক খাবার খেয়ে ফেললাম। আর তারপরই, বলা বাহুল্য, খুব জল তেষ্টা পেল। কিন্তু টেবিলে কাঁচের গ্লাসও নেই, জলের জগও নেই। ম্যানেজার সাহেব পাশেই ছিলেন ঃ বললাম, "প্রত্যেকের তেষ্টা পেয়েছে, জল দিন। " ম্যানেজারও তেমনি। বিজ্ঞের মতো চোখ বুঁজে বললেন, আপনাদের যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে তো কফি, চা, কোকো যা ইচ্ছে খেতে পারেন। সবই মজুত আছে। বলে উনি এক ট্রে ভর্তি কাপে কফি এনে আমাদের দিলেন। কিন্তু জলের তেষ্টা কি আর ওতে মেটে? বললাম—এসবে চলবে না,—জল চাই, জল দিন। তিনিও কম যান না। বললেন, "আপনি তো জাদুকর, এগুলোকে জল বানিয়ে খেয়ে ফেলুন না। " আমি বুঝলাম, ভদ্রলোক চালাক হওয়ার চেষ্টা করছেন। বললাম, "হ্যাঁ, তাই তো করবো, আগে সবাইকে দিন দেখবেন আমরা কেমন জল বানিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে নিচ্ছি। " ম্যানেজারের চোখ চক চক করে উঠল। দৌড়ালেন আরও চা-কফি আনতে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তখন দলের একজনকে দিয়ে চট করে একটা কাজ সেরে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম। ম্যানেজার তখনও আসেনি। তাই জানতেও পারলেন না। যখন ফিরে এলেন, আমরা তখন তাঁর হাত থেকে কফির কাপগুলো নিয়ে দলের সবাই মিলে স্ট্র দিয়ে খেতে লাগলাম। ম্যানেজার বললেন, "আপনি বললেন, কফিকে জল বানিয়ে খাবেন, কৈ তা তো করলেন না। " আমি বললাম, "আরে! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?" এগুলো তো আমরা জলই খাচ্ছি। স্ট্র দিয়ে খেলে কফি জল হয়ে যায়। ম্যানেজার বললেন, "আপনি ঠাট্টা করছেন!" আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "আরে ঠাট্টা কি

মশাই— খেয়ে দেখুন না, মুখে যেতেই কেমন জল হয়ে যাচ্ছে। ” আমি এক কাপ কফি আর একটা স্ট্র তাঁর হাতে দিয়ে খেতে বললাম। তিনি অবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেন, আর তারপরই চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার পালা। চেঁচিয়ে উঠে বললেন, “আরে! এতো সত্যি সত্যি জল খাচ্ছি। ”

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, এটা হতে পারে না, বাজে কথা। আসলে কিন্তু এটা ভীষণ সহজ ব্যাপার। এবং পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। ম্যানেজার যখন প্রথমবার আমাদের কফি দিয়ে গেলেন, তখন আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম, সেগুলো বেশ গরম।

আমি তখন দলের একজন সহকারীকে দিয়ে বাথরুম থেকে এক কাপ ঠান্ডা জল আনিয়ে তার ওপরে চামচে করে খুব আস্তে আস্তে করে পাঁচ চামচ গরম কফি ছেড়ে দিয়েছিলাম। চামচেতে কফি নিয়ে ছাড়বার একটা বিশেষ কায়দা আছে। প্রথমে চামচটা ভর্তি করে গরম কফি নাও। তারপর

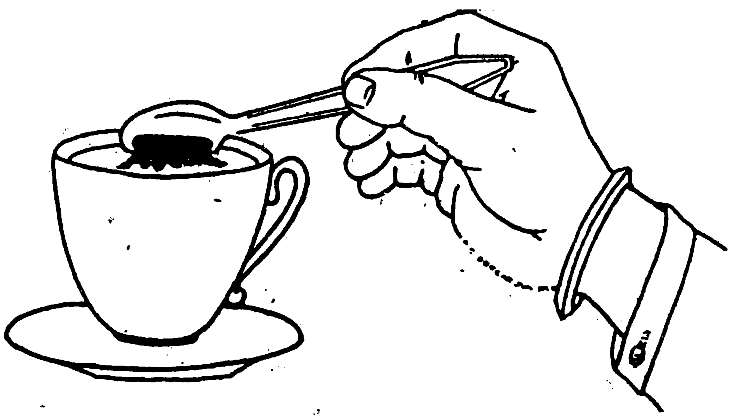

সেটা ঐভাবেই আস্তে আস্তে করে কাপের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। চামচটা যেন কাপের জলের তলার দিকে না যায়। সবসময়েই যেন জলের ওপর

দিকে থাকে। তারপর চামচটাকে খুব আস্তে খাড়া করে বাইরে বের করে আনো। এভাবে পর পর পাঁচ-ছ'বার করলেই ঐ কাপের ওপর দিকটা গরম কফিতে ভর্তি থাকবে। আর তলায় থাকবে ঠান্ডা জল। কফির সঙ্গে ঐ জল মিশবে না, কারণ, কফি ছিল গরম আর কলের জলটা ছিল কনকনে ঠান্ডা। বিজ্ঞান বলে, জল গরম হলে অপেক্ষাকৃতভাবে হালকা হয়ে যায় এবং সেজন্য ওপরের দিকে থাকে আর ঠান্ডা জল ভারি হিসেবে তলার দিকে জমা থাকবে। কাজটাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হবে। জোরে ঝাঁকুনি হলে দুটোই মিশে যাবে। যাই হোক, এভাবে একটা কাপে ঠান্ডা জলের ওপর গরম কফি রেখে আমি চুপচাপ বসেছিলাম। ম্যানেজার এসবের কিছুই জানতেন না, তার হাতে ঐ বিশেষ জলভরা কফির কাপটা তুলে দিই। তিনি স্ট্র দিয়ে কফি খেতেই তলার ঠান্ডা জলটা খেতে শুরু করলেন; তিনি ভাবলেন কফি বোধহয় সত্যি সত্যি জল হয়ে যাচ্ছে। দলের বাকিরা আমরা কিন্তু সত্যি সত্যিই কফি খেয়েছিলাম, শুধু অভিনয় করে বলেছিলাম সবাই জলই খাচ্ছি।

বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব এলে তোমরা এটাকে দুধ আর কফির লিকার দিয়ে দেখাতে পারো। তলায় থাকবে ঠান্ডা কফি আর ওপরে গরম দুধ। অথবা উল্টো, যেভাবে তোমাদের ইচ্ছে।

'ভয়ে'র ম্যাজিক

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন সেরে যাচ্ছি মোম্বাসার দিকে। সাভো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা লম্বা পথ। বিরাট জঙ্গল; আট হাজার বর্গমাইলেরও বেশি—আর নানারকম জন্তু-জানোয়ারে ঠাসা। জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, গন্ডার আর নানারকম হরিণের পাল তো আছেই–স্থানীয় গভর্নমেন্টের হিসেবে বিশ হাজারের মতো হাতিও নাকি আছে এখানে।

মাঝপথে একটা বড়োসড়ো গ্রাম আছে, তার নাম 'ভয়'। নামটা বোধহয় লোকে হিসেব করেই রেখেছিল। কারণ, ওরকম ভয়াবহ জঙ্গলের মাঝখানে বিশ হাজার জংলী হাতি ঘেরা গ্রামের নাম 'ভয়' ছাড়া আর কি হতে পারে? যাই হোক, অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে আছি; পায়ে যেন মরচে ধরে গেছে। একটু দাঁড়াতে পারলে ভাল হতো। আমাদের ড্রাইভার 'জর্জ কিবুকু' বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন স্যার। সামনেই 'ভয়'–সেখানে চা পাওয়া যাবে।" ভাল কথা। 'ভয়' পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা যাক।

আধঘন্টা পর ওখানে পৌঁছুলাম। একটা চা-এর দোকানের কাছে নামলাম সবাই। দোকানে তখন স্থানীয় লোকেদের বেশ ভিড় এবং প্রায় সব কটা চেয়ারই দখল করা। আমাদের দলের সবাইকে স্থান দেয়া সম্ভব নয় এবং দেখলাম কারোরই চেয়ার ছাড়ার আশা নেই—সবাই বেশ আড্ডায় মশগুল। আর শুধু তাই নয়, স্বভাব চরিত্রও কেমন অভদ্র প্রকৃতির। অভদ্র মানুষেরা সাধারণতঃ বোকা হয়ে থাকে। মাথায় একটা বদ বুদ্ধি জাগলো; আমি গাড়িতে গিয়ে একটা কিছু নিয়ে এসে কোনও মতে একটা চেয়ার দখল করলাম। দোকানের কর্মচারী এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি খাবেন?" আমি বললাম, "লেটে চাই-ই।" অর্থাৎ এক কাপ চা দাও। বিদেশী হয়েও আমি স্থানীয় সোয়াহিলী ভাষায় কথা বললাম দেখে অনেকেরই দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়লো। আমি তখন করলাম কী, সবাইকে দেখিয়েই আমার ডান হাতের পাতায় জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে বিড় বিড় করতে লাগলাম। আর তারপর নির্দেশক আর বুড়ো আঙুল দুটোকে জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম।

এভাবে একবার ফুঁ দিই আর কিছুক্ষণ করে ঘষবার পর আমার আঙুল দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। ধোঁয়া যখন বেশ বেরোচ্ছে তখন আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সবাইকে দেখতে লাগলাম। চারদিকের সবাই চুপ হয়ে গেল। পাশে ছিল ষন্ডামার্কা স্থানীয় একজন লোক। সে গোল গোল চোখ করে চেয়ার ছেড়ে সরে গেল। "বাওয়ানা মুচাবি—হাটারি" বলে একজন

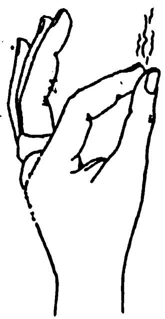

হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল। কথাটার মানে হচ্ছে, "মিস্টার জাদুকর এসেছে, বিপদ–।" আর কোনও কথা নেই। বিশ্বাস করো বা না করো, এক এক করে সবাই বাইরে চলে যেতে আরম্ভ করলো। এক মিনিটের মধ্যেই পুরো রেস্টুরেন্টটা হয়ে গেল একদম ফাঁকা। আমি জানতাম আফ্রিকার এই স্থানীয় লোকজন ম্যাজিক জিনিসটাকে ভীষণ ভয় পায়।

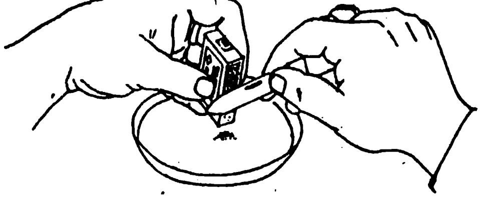

ওদের ধারণা, জাদুকররা শখ করেই নাকি অন্যের ক্ষতি করে। বিরাট কুসংস্কার। বেচারা। তবে যাই হোক না কেন—রেস্টুরেন্টে চেয়ার পাওয়া গেল। সদলে ছাব্বিশজনই আমরা ভালভাবে বসতে পারলাম। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ—হাত থেকে ধোঁয়া বেরুলো কিভাবে? মন্ত্র তো নিশ্চয়ই নয়। আসলে এটা একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপার। জাদু আমার পেশা–সেজন্য অনেক কিছুই তৈরি রাখতে হয়। এ কৌশলটাও তৈরি ছিল। দেয়াশলাই-এর বাক্সে যে বারুদ লাগানো থাকে সেটা হচ্ছে রেড ফসফরাস। অনেকগুলো দেয়াশলাই-এর বাক্স থেকে ঐ বারুদ ছুরি দিয়ে ঘষে একটা প্লেটে জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে দেখা যাবে ঐ প্লেটের ওপর হলুদ রঙের একটা তৈলাক্ত আবরণ পড়েছে। ঐ তৈলাক্ত পদার্থ বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মধ্যে লাগিয়ে ঘষলেই ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। আগের থেকে আলতোভাবে ঐ পদার্থ লাগিয়ে রাখলে কারোরই চোখে পড়বে না। আমি ওই পদার্থ আগের থেকে তৈরি করে একটা শিশিতে জমিয়ে রেখেছিলাম। গাড়িতে গিয়ে আঙুলে সেগুলো লাগিয়ে এসে চেয়ারে বসেছিলাম।

জাদুর জুডো

জাপানের ইয়োকোহামা শহরে আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম মাসাহারু। সাধারণ জাপানীদের মতো চেহারা হলেও সে অন্যান্য বয়স্ক জাপানীদের থেকে বেশ খানিকটা লম্বা। আমি তাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম—'তোমরা অন্যান্য সবার থেকে লম্বা হলে কি করে?' সে মুচকি হেসে বলেছিল—'পাঁউরুটি খেয়ে। আগে তোমাদের মতো বাঙালিদের মতো শুধু ভাতই খেতাম। গত কয়েক দশক ধরে 'গম' আমাদের দেশে ভাতের চেয়েও বেশি পপুলার হয়েছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকদের হিসেব অনুযায়ী এ গম' খাবার পর থেকে এ দেশের নতুন জেনারেশনের সবাই অন্তত পক্ষে এক ইঞ্চি লম্বা হয়েছি।'

মাসাহারু কিন্তু আমার সাধারণ বন্ধু নয়। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী সে। যেমন ধরো সে খুব ভাল ব্যালে নাচতে পারে, জাপানি কবিতা আবৃত্তি করতে পারে এবং শুধু তাই-ই নয়, খুব ভাল 'জুডো' জানে। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার পর থেকে ও আমার কাছে জুডোর শিক্ষক হয়ে গেছে। সময় পেলেই আমি তার কাছে জুডো শিখতাম। তবে হ্যাঁ, শিক্ষাটা একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে নয়। তার বিনিময়ে আমাকে ম্যাজিক শেখাতে হতো। জাদুর বিনিময়ে জুডো। আমার কাছে সে জুডো-গুরু, আর তার কাছে আমি জাদু-গুরু।

মনে আছে, প্রথম দিন জুডো শেখার পর সে আমায় ধরে বসলো এমন একটা ম্যাজিক শেখাতে যার মধ্যে আত্মরক্ষার ছোঁয়া আছে। আমি বললাম, খুলে বলো কি ধরনের ম্যাজিক?' সে হাত পা নেড়ে বলতে লাগলো-'এই যেমন ধরো এমন একটা কৌশল, যা দিয়ে ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানো যায় অথবা কোন জিনিস নষ্ট করতে চাইলেও নষ্ট হবে না-এ রকম।'

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। নষ্ট করলেও নষ্ট হয় না—তা আবার হয় নাকি! একটু চিন্তা করতেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

একটা বেলুন ফুলিয়ে তার কাছে এনে আমি বললাম, 'এর মধ্যে একটা পিনের খোঁচা দিলে কি হবে তুমি নিশ্চয়ই জানো।' সে বললো-'হ্যাঁ, ফট্ করে বেলুনটা ফেটে যাবে।'

আমি বললাম-'কিন্তু যদি আত্মরক্ষার ম্যাজিক জানা থাকে তাহলে পিনের খোঁচা দিলেও এটা ফাটবে না।' সে বললো 'তাই নাকি! দেখাও তো।'

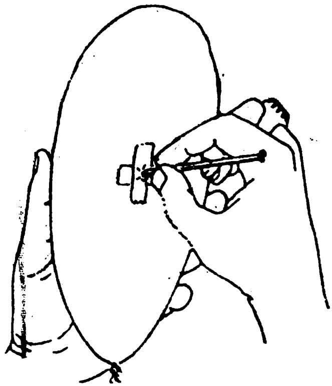

আমি তখন করলাম কি—পকেট থেকে একটা লম্বা পেরেক বের করে তাতে একটু ফুঁ দিলাম; তারপর এক-দুই-তিন বলেই বেলুনটার মধ্যে পট্ করে ফুটিয়ে গেঁথে দিলাম। পেরেকটার অর্ধেকটা বেলুনের ভেতর ফুটে ঢুকে রইল। অবাক কান্ড! বেলুনটা কিন্তু ফাটলো না। মাসাহারু দুকানে আঙুল দিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে বললো—'বেলুনটা ফাটছে না তো...!'

সরঞ্জাম হিসেবে এটার জন্য চাই একটা বড় বেলুন, একটা ভাল লম্বা ধারালো পেরেক অথবা বড় একটা ছুঁচ আর কিছুটা চওড়া সেলোটেপ। প্রথমে বেলুনটাকে যতদূর সম্ভব ফোলাও। তারপর তার ওপর একটু সেলোটেপ ভাল করে সেঁটে লাগিয়ে দাও। বেলুনটা টানটান করে ফোলানো থাকলে সেলোটেপ লাগাতে সুবিধা হবে আর সেলোটেপটা একটু চওড়া হলে ভাল হয়। যাই হোক—এই হল ম্যাজিকের প্রস্তুতি। এবার পিনটাকে নিয়ে ঐ সেলোটেপের ঠিক মাঝখানটায় ফুটিয়ে দিলে দেখবে—তোমরাও অবাক হয়ে যাচ্ছ। বেলুনটা ফাটবে না। দর্শকরা ঐ সেলোটেপের কথা জানতো না—সুতরাং তারা তো খুব অবাক হবেই।

চওড়া সেলোটেপ যদি তোমরা না পাও, তাহলে সরু সেলোটেপও ব্যবহার করতে পারো। তবে সরু সেলোটেপ ব্যবহার করার সময় বেলুনের ওপর যোগ চিহ্ন বা 'ক্রস'-এর মতো করে লাগানো ভাল। 'ক্রসের' ঠিক মাঝখানে তোমাকে ছুঁচ ফোটাতে হবে।

ফুঁ-এর ছুরি

এ ম্যাজিকটা এতই সহজ যে তোমরা যখন তখন যেখানে সেখানে দেখাতে পারবে। তবে হ্যাঁ, কিভাবে দেখাবে সেটাই নির্ভর করছে কোথায় দেখাবে তার ওপর। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ ম্যাজিকটা আমি অনেকদিন আগে জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর প্রয়াত যামিনী রায়কে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম। যামিনীবাবু আমার ম্যাজিক খুব ভালবাসতেন। সময় পেলেই আমায় ম্যাজিক দেখাতে বলতেন। তাঁর ছবি আঁকা দেখার লোভ আমার ছোটবেলা থেকেই। আর সেজন্য কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই আমি তাঁর স্টুডিওতে হাজির হতাম। তখনই বসতো ম্যাজিকের আসর। একদিন সকালবেলায় যখন আমি তাঁর বাড়িতে গেছি, তখন সবে তিনি প্রাতঃরাশে বসেছেন। অসামান্য মানুষের সামান্য বাঙালি খানা-হাতে একবাটি মুড়ি, পাশে ছোট্ট একটা প্লেটের মধ্যে পাটালিগুড় আর একটা কলা। আমি ঘরে ঢুকেই লজ্জায় পড়লাম। ভাবলাম-আমার এই আকস্মিক আবির্ভাব বোধহয় খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটালো। কিন্তু আমাকে দেখেই তিনি বললেন-"এই যে 'যাদুপুত্তুর' এসো বসো—কিছু খাবে নাকি?" যামিনীবাবু আমায় যাদুপুত্তুর বলে ডাকতেন, আর বাড়িতে গেলেই কিছু না কিছু খেতে বলতেন। আমি বললাম-না, কিছু খাব না- এইমাত্র খেয়ে এসেছি।" তিনি নাছোড়বান্দা; বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে-এই কলাটা আমরা দুজনে ভাগ করে খাচ্ছি। তুমি অর্ধেক, আমি অর্ধেক।" হাতের কাছে তিনি ছুরিটা খুঁজে পেলেন না—বললেন—"দাঁড়াও আমি ছুরিটা নিয়ে আসি।" আমার আপত্তি তিনি শুনলেন না, পাশের ঘর থেকে ছুরিটা আনতে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে আমি কলাটা হাতে নিয়ে একটা কাজ সেরে রাখলাম। কি করেছিলাম সেটা পরে বলছি। যাই হোক তিনি তো ছুরিটা নিয়ে এলেন। আমি বললাম—"কলাটা যখন ভাগ করতেই চাইছেন তখন ছুরির আর কি প্রয়োজন ছিল, ম্যাজিক করলেই হতো, ম্যাজিক করেই তো ওটাকে ভাগ করা যায়।" যামিনীবাবু হেসে বললেন—"করো বাপু তাহলে তোমার যাদু" আমি বললাম, "কলাটা আপনি হাতে নিন; দেখুন ওটা সম্পূর্ণ আস্ত এবং খোসা ছাড়ানো-টাড়ানো নেই—তাই তো? এবার আপনি কলাটাকে যে

ক'টা ভাগে ভাগ করতে চান ততবার ফুঁ দিন, দেখবেন ঐ ফুঁ-এর জোরে কলাটা তেমন ভাগ হয়ে যাবে। যামিনীবাবু একটু মুচকে হেসে কলাটাকে দুবার ফুঁ দিলেন। কলাটার কিন্তু কিছু হল না—যেমন ছিল তেমনই রইল। তিনি বললেন, "কৈ বাপু, ভাগ হলো না তো!" আমি বললাম, "বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, খোসাটা ছাড়ালেই দেখতে পাবেন কেমন সুন্দর দু-ভাগ হয়ে গেছে।" যামিনীবাবু আমার কথামতো কলাটাকে আস্তে আস্তে ছাড়াতে শুরু করলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার!। কলাটা ভেতরে ঠিক মাঝামাঝি দু টুকরো হয়ে রয়েছে। খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি এ ম্যাজিকটা দেখে।

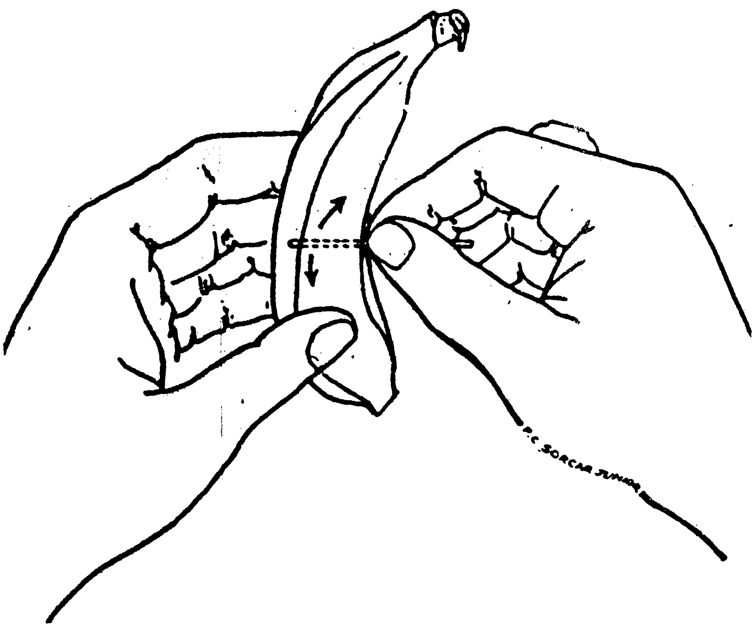

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ কিভাবে হলো এটা! কলার খোসা ঠিক রয়েছে অথচ ভেতরটা কি করে কাটা হলো? তাই নয় কি? যামিনীবাবু যখন

ছুরি আনতে পাশের ঘরে গিয়েছিলেন তখনই আমি আমার কৌশলটা সেরে নিয়েছিলাম। আর সেটাই এখন তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি করেছিলাম কি, একটা দেয়াশলাই-এর কাঠি কলাটার ঠিক মাঝখানে ফুটিয়ে গেঁথে সেটাকে ডানদিকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলাটার ভেতরের অংশটা কেটে ফেলেছিলাম, কাটা হয়ে যাওয়ার পর কাঠিটা বের করে নিলে বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝা যাবে না। আমি কলাটাকে মাত্র দু টুকরো হওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কারণ, আমরা মাত্র দুজনেই ওখানে ছিলাম এবং সেজন্য উনি যে মাত্র দুটো ভাগই করতে চাইবেন সেটা বুঝেছিলাম। সেজন্য সাহস করে বলেছিলাম যতগুলো ভাগ করতে চান ততবার ফুঁ দিন। বলা বাহুল্য, উনি দু'বার ফুঁ দিয়েছিলেন। ছুঁচ ফুটিয়ে বা সরু কাঠি দিয়ে এভাবে কলাটাকে অনেক ভাগেই ভাগ করা যায়—বাইরের থেকে কিছু বুঝতে পারা যাবে না। তোমরা একটু অভ্যাস করে বন্ধুদের দেখিও—দেখবে তারা কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে।

লাল কালি নীল কালি

ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরের এম্পায়ার থিয়েটার হলে তখন আমার ইন্দ্রজাল চলছে। প্রত্যেকদিন দুটো করে অনুষ্ঠান। সুতরাং বুঝতেই পারছ–সারাদিনে ছুটি একদম নেই। দুটো প্রদর্শনীর মাঝখানে শুধু তিন ঘণ্টার অবসর। তখন ইচ্ছে করলে একটু বাইরে বেরোন যায়; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মুখের মেক-আপ তুলে বেরিয়ে এসে আবার মেক-আপ করতে কিছুতেই মন চাইতো না, আমার মেক-আপ তো আবার সাধারণ মেক-আপ নয়–গোঁফ পাকানো, তিলক লাগানো ম্যাজিকের মেক্-আপ।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো সেদিন কিছু না কিছু মজার ঘটনা ঘটতই। তাদের মজার মজার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মজার ঘটনারও আবির্ভাব হত। একদিন হয়েছে কি, একটা স্কুল থেকে গোটা পঁচিশ ছাত্র-ছাত্রী আমার ইন্দ্রজাল দেখে, ড্রেসিং রুমে দেখা করতে এসেছিল। ওদের টিচার এসে প্রথমে বললেন–"আপনাকে কাছের থেকে দেখার ওদের খুব শখ, তাই নিয়ে এলাম। এখানে–আশা করি আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।" আমি বললাম– "না, না ভালই করেছেন। ঘণ্টা তিনেক ছুটি আছে–সুতরাং মনের আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করতে পারবো।" শুনে সবাই খুব খুশি হলো। আমি সবাইকে চেয়ার ভাগাভাগি করে বসতে বললাম। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম–"কোন্ ম্যাজিকটা তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?" সে একটু চিন্তা করে বললো–'ভয়ের ম্যাজিকটা।' পাশের ছেলেটা ভেঙে বললো, 'যে খেলাটাকে ডায়নামাইট দিয়ে আপনাকে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সে খেলাটা–আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম–আচ্ছা, কিভাবে করলেন?'

একটা বাচ্চা মেয়ে বললো, "আমি জানি কিভাবে …।" সবার চোখ গিয়ে পড়লো তার ওপর। জিজ্ঞেস করলাম "বল তো কিভাবে আমি ঐ ডায়নামাইটের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম?" সে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ফিক ফিক করে হেসে বললো–"ম্যাজিক করে।" আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

নানারকম কথাবার্তা হতে হতে সবশেষে উঠলো আসল কথা। সে বাচ্চা মেয়েটাই বলে বসলো—"একটা ম্যাজিক শিখিয়ে দেবেন?" আমি জানতাম ওরা একথা বলবেই। পৃথিবীর সব জায়গাতেই এ এক কথা আমি শুনে আসছি।

আমি একটা সাদা কাগজের টুকরো আর পেন নিয়ে তাদের বললাম—পর পর নাম লিখতে। তারা একের পর এক নাম লিখতে লাগল। ছয়জনের নাম লেখার পর আমি সে কাগজটা আমার হাতে নিয়ে বললাম—'দেখো—এতে তোমাদের নাম লেখা আছে। তোমরা নিজের হাতে লিখেছ। সবাই একই পেন দিয়ে লিখেছ এবং দেখতেই পাচ্ছ পেনের কালিটা নীল রঙের। কিন্তু এবার যদি আমি লিখি—ঐ একই পেন দিয়ে—একই কাগজের ওপর, তাহলে সে লেখার রং লাল হয়ে যাবে।' বলে আমি লিখতে আরম্ভ করলাম। সবাই অবাক—আমার বেলায় লেখাটা সত্যি সত্যিই লাল রঙের হয়ে গেল।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ পেনের মধ্যে কোনও কারসাজি করা আছে। তারাও প্রথমে তাই ভেবেছিল। আসলে পেনটা একেবারে সাধারণ পেন—যে কেউই পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এর আসল কৌশলটা রয়েছে পেনের কালিতে এবং কাগজটাতে। পেনের কালি হিসেবে আমি ঘন ব্লু লিটমাস সলিউশন ব্যবহার করেছিলাম। ব্লু লিটমাস সলিউশন দিয়ে ঠিক কালির মতোই লেখা পড়বে—তফাৎটা কেউই বুঝতে পারবে না। আর ওদিকে সাদা কাগজটার এক বিশেষ অংশে আমি আগের থেকে একটু লেবুর রস ঘষে লাগিয়ে রেখেছিলাম। পুরো কাগজটায় নয়, যে অংশে আমি লিখবো, হিসেব করে ঠিক সে জায়গাটায়। লেবুর রসে সাইট্রিক অ্যাসিড আছে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলেই নীল লিটমাস সলিউশন লাল হয়ে যায়।

ব্লু লিটসাম সলিউশন—খুব সহজেই কেমিস্ট-এর দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি থেকেও এটা সংগ্রহ করতে পারবে। আগের থেকে তৈরি করে শুকিয়ে খটখটে করে রেখে হঠাৎ করে দেখালে ভীষণ চমক সৃষ্টি হয়। আমি আমার কাছে সব সময় ওরকম দু একটা কাগজ তৈরি করে রেখে দিই। একটা পেন-এ সবসময় ব্লু-লিটমাস ভরে রাখি। তাতে কালির কাজও হয়, ম্যাজিকও হয়। প্রস্তুত হয়ে থাকলে তো ম্যাজিক দেখানো সহজ। তাই নয় কি?

পাঁচ পয়সাকে দশ পয়সা করা

এখন যে ম্যাজিকটা শেখাচ্ছি তাতে কৌশলটা প্রধান হলেও এর সাফল্য নির্ভর করছে দেখানোর কায়দায় ওপর। আমি যেভাবে তোমাদের শেখাচ্ছি সেটা যদি তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় তাহলে তোমরা একটু ঘুরিয়ে তোমাদের মতো করে দেখিও। মনে রাখবে—যত সহজ সরলভাবে ম্যাজিক দেখানো যায়—দর্শকরা ততই মন্ত্রমুগ্ধ হন। আর তাছাড়া যে ম্যাজিকই হোক ঠিক মতো অভ্যাস না করে দেখানো উচিত নয়। সুতরাং বার বার অভ্যাস করে সহজভাবে তোমাদের বন্ধুদের দেখিও। আমার বাবা বলতেন—ম্যাজিকের সাফল্য নির্ভর করছে তিনটে জিনিসের ওপর; প্রথমটা হচ্ছে—'অভ্যাস করা', দ্বিতীয়টা হচ্ছে 'ঠিকমতো অভ্যাস করা' আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে দরকারী কথা হলো 'আবার অভ্যাস করা। কথাটার মানে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এটা হলো ম্যাজিকের মধ্যে তিন সত্যির মতো আসল কথা। ম্যাজিক করতে গেলে বারবার অভ্যাস করতে হয়।

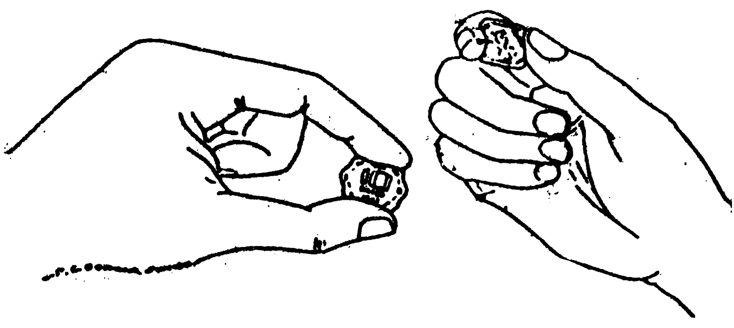

প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। যাদুকরের হাতে একটা সাধারণ পাঁচ পয়সা রয়েছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মধ্যে তিনি পয়সাটাকে ধরে আছেন। ঐ পাঁচ পয়সাটা ছাড়া তাঁর দুহাতে আর কিছুই নেই।

সবার সামনেই তিনি পয়সাটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিলেন। ডান হাতের আঙুল দিয়ে পয়সাটা ধরা আছে। অবাক কান্ড–চোখের সামনেই সেটা দশ পয়সার মুদ্রা হয়ে গেছে! যাদুকর পয়সাটাকে আঙুলের ফাঁকে রেখেই উল্টে দেখালেন–পয়সাটার পেছনে ছাপও আছে দশ পয়সার। সবাই অবাক। দুহাতে আর কিছু নেই।

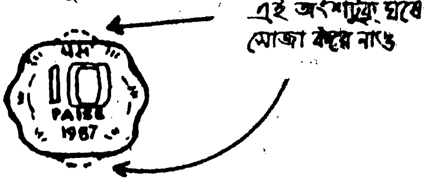

তোমরা ভাবছ এটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন ম্যাজিক। অনেক কারসাজি আছে এটার পেছনে। আসলে এটা কিন্তু ভীষণ সহজ ম্যাজিক। ভীষণ সহজ এর কৌশল। এর জন্য একটা ছোট্ট প্রস্তুতি চাই। একটা দশ পয়সার মুদ্রা হাতে নাও। নতুন দশ পয়সার যে হালকা মুদ্রা বেরিয়েছে সেটা নয়—পুরনো দশ নয়া পয়সার মুদ্রার কথা বলছি। গুণে দেখ ঐ পয়সাটার চারপাশে মোট আটখানা বাঁক আছে। তোমাকে করতে হবে কি–ঐ বাঁকের যে কোনও একটা বাঁককে ফাইল দিয়ে ঘষে সমান করে ফেল আর তারপর সেই বাঁকটার ঠিক উল্টোদিকের বাঁকটাকেও ঘষে ঘষে সমান করে ফেল। আমি কি বলতে চাইছি তা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

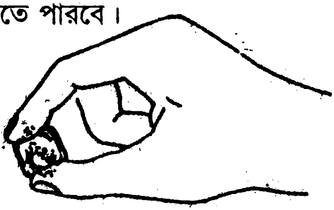

ব্যস্ এবার ম্যাজিকের সরঞ্জাম তৈরি। এখন অভ্যাস করার পালা। ১নং ছবি অনুযায়ী এই বিশেষ মুদ্রাটাকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মাঝখানে ধর। ঘষা ধার দুটো দুধারে রইল। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো–কি দেখছে তারা। সবাই বলবে পাঁচ পয়সা।

এবার আঙুল দুটো ধরা অবস্থাতেই পয়সাটাকে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঘষা দিকটা ধরে বাঁ হাতটা ছেড়ে দাও। দেখবে, এবার মনে হচ্ছে ডান হাতে এসে সেটা দশ পয়সা হয়ে গেল।

পুনর্জন্ম

মৃত্যুর পর কি হয়? তখনও কি আত্মা বেঁচে থাকে? এ নিয়ে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। এ আলোচনা এখনও চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে। অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞান, বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এ পাঞ্জা-লড়াইকে কেন্দ্র করে কত মজার গল্প যে ছড়িয়ে আছে, তার কোনও হিসেব নেই। কিন্তু সেগুলো নিছকই গল্প। এসব গল্প ঘিরেই তৈরি হয়েছে সাহিত্য। এখানে গল্পের গরু গাছে উঠলেও আমাদের আপত্তি নেই। এখন ঐরকমই একটা 'সাহিত্য' ম্যাজিক তোমাদের শেখাচ্ছি। মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব কি না জানি না; আজ পর্যন্ত তা ঘটতে তো দেখিনি, কিন্তু মৃত বা নষ্ট কোনও বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করা বা আবার ব্যবহার করে দেখানোর ম্যাজিকে কম বাহাদুরি নেই। না, আমি 'রিসাইকল' করার কথা বলছি না। সে তো একেবারে অন্য প্রসঙ্গ, আমি বলছি 'রি-ইনকারনেশন' বা 'পুনর্জন্ম'র কথা। জাদুকর দর্শকদের কাছে এসে পুনর্জন্ম, তার প্রতি বিশ্বাস, অবিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বললেন এবং তারপর বললেন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করা যায়। শুনে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন, অনেকেই করবেন প্রতিবাদ। জাদুকর তখন তাঁর কথা প্রমাণ করতে 'অ্যাশট্রে' থেকে একটা পোড়া দেয়াশলাই-এর কাঠি নিয়ে বললেন, "এটাকে আমরা মৃত দেয়াশলাই কাঠি বলতে পারি। দেখা যাক ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই 'মৃত' কাঠিটাকে জীবন্ত বা সতেজ করে তুলতে পারি কি না।" কাঠিটা নিয়ে তিনি দু'আঙুলে ধরে তার দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকলেন। যেন জাদুকর তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করছেন। একটু পরেই সেই পোড়া কাঠিটা নিয়ে দেয়াশলাইয়ের বাক্সের গায়ে বারুদে ঘষলেন। মুহূর্তে অবাক কান্ড। মৃত কাঠি পুনরুজ্জীবিত হয়ে গেছে। ওটা ফস করে জ্বলে উঠল।

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। এটা কি করে সম্ভব? পোড়া কাঠি আবার জ্বলবে কিভাবে? তা কখনও হয় নাকি। ঠিকই ধরেছ। পোড়াকাঠি আবার দ্বিতীয়বার নতুন কাঠির মতো জ্বলতেই পারে না, তা হলে এটা হল কিভাবে? এটাই তো ম্যাজিক, সব ম্যাজিকের মতো এটাও মিথ্যেকে সত্যি দেখাবার অভিনয় এবং কায়দা। কাঠিটা মোটেই পোড়া কাঠি ছিল না। ওটা একটু নতুন, শক্ত ভাল কাঠি, তবে ওর বারুদের পাশে কাঠের অংশটায় ব্লেড দিয়ে ঘসে সরু করে নিয়ে তাতে 'চাইনিজ ইঙ্ক' দিয়ে কালো রং করে শুকিয়ে রাখা ছিল। দেখে মনে হবে পোড়া কাঠি, আসলে তা মোটেই নয়। এই হল কৌশল, বাকিটুকু অভিনয়।

গরম বরফ

বরফ কখনও গরম হয়? এ তো অসম্ভব ব্যাপার। আর অসম্ভব বলেই আমি এটাকে মঞ্চে 'সম্ভব' করে দেখাতে চাইছি। সব ম্যাজিকই তো তাই। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো। আগেই বলেছি ম্যাজিকে মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই। সবই বিজ্ঞানভিত্তিক। উদ্দেশ্য একটাই, মনোরঞ্জন।

জাদুকর সকলের সামনে একটা বরফের টুকরো নিয়ে সেটাকে একটা কাচের গ্লাসে ঠকাস করে রাখলেন। তারপর এক বোতল জল নিয়ে তাতে ঢাললেন। জলে বরফটা ভেসে উঠল। সবই স্বাভাবিক, সবই সাধারণ। এবার জাদুকর একটা চামচ নিয়ে ঐ বরফটাকে জলের মধ্যে ফেলে দিলেন। বরফটা জলে পাক খেতে লাগল। তারপর জাদুকর ঐ গ্লাসের একটু জল দর্শকদের একজনের হাতে ঢাললেন। অবাক কান্ড! বরফটা যদিও তখনও জলে আছে, তবুও জল কিন্তু ঠান্ডা নয়, বরং তুলনামূলকভাবে বেশ গরম। সকলে তাজ্জব। কি করে এটা হল। বরফ, জলে কখনও গরম হয়?

তোমরা ভাবছ, এটা নিশ্চয়ই কোনও 'কেমিক্যালস'-এর কারসাজি। মোটেই না, এটা পুরোপুরি চোখে ধাঁধা দেয়া 'পিওর ফিজিক্স'-এর একটা ম্যাজিক। বরফটা সাধারণ, কিন্তু তাতে একটা কায়দা করা ছিল। আগে থেকে এক টুকরো সেলোফেন পেপার (পলিথিন নয়) নিয়ে ঐ বরফটায় মুড়ে রাখা ছিল। আর বোতলে রাখা ছিল ফুটন্ত গরম জল। বরফটাকে নিয়ে গ্লাসে ফেললে ঠকাস করে আওয়াজ হবে। তাতে কারও কোন সন্দেহ থাকবে না, এবার বোতল থেকে গরম জল ঢাললে ঐ বরফ যাবে গলে, কিন্তু সেলোফেন পেপ্পারের জন্য দেখে মনে হবে বরফটা তখনও আছে। বেশি গরম জল ঢাললে বরফের শীতলটা কেটে জলটা বেশ গরমই হয়ে যাবে। বরফটা যে গলে জল হয়ে গেছে, তা কিন্তু দর্শকেরা বুঝবেন না। গরম জল থেকে 'স্টিম' বা 'বাষ্প' বের হলে তাঁরা ভাববেন বরফের হিমশীতল বাষ্প বের হচ্ছে। বাকিটুকু অভিনয়। একটু ভেবেচিন্তে অভ্যাস করে দেখিয়ো, গ্লাসটা সময় মতো সরিয়ে নিও, দেখবে বড় 'কেমিস্ট' বা 'প্রফেসর'রাও কেমন ঘাবড়ে গেছেন।

ম্যাজিকের ব্লটিং পেপার

এটা একটা কেমিক্যাল ম্যাজিক, কিন্তু ভালভাবে দেখলে জাদুমন্ত্রের কারসাজি বলে মনে হতে পারে। ছোট্ট খেলা, কিন্তু বেশ মজাদার।

দর্শকদের একজন কাউকে একটা ফাউন্টের পেন দিয়ে বলো, কাগজে তাঁর নাম সই করতে বা একটা কিছু লিখতে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে লিখলেন। এবারে জাদুকর একটা সাদা ব্লটিং পেপার নিয়ে ঐ লেখাটার ওপর চাপ দিয়ে বললেন, "ছি-ছু-ছাঃ····ভ্যানিশ হয়ে যা।" ব্লটিং পেপারটা সরানো হল। আরে, লেখাট 'ভ্যানিশ'! আবার লিখে আবার চাপ দেয়া হল, আবার ভ্যানিশ।

এটা দেখাতে গেলে আগে থেকে একটু প্রস্তুতি দরকার। একটা গ্লাসে জল নিয়ে তাতে অগ্‌জালিক অ্যাসিড ঢালো। হার্ডওয়্যারের দোকানে অগ্‌জালিক অ্যাসিড পাবে। মেঝে ঘষে পরিষ্কার করতে এটা ব্যবহার করা হয়। জলের মধ্যে ঐ অ্যাসিডের পাউডার বেশ খানিকটা দিয়ে একটা 'সলিউশন' তৈরি করো এবং সেই সলিউশনে ব্লটিং পেপারটা চুবিয়ে রাখ। ব্লটিং পেপার ঐ অ্যাসিড-জল শুষে নিলে সেটা রোদে শুকিয়ে খটখটে করে নাও। ব্যস্, তোমার ম্যাজিকের সরঞ্জাম তৈরি।

ফাউন্টেন পেনের কালিতে যা যা উপাদান থাকে তা অগ্‌জালিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে রং কেটে জলের মতো হয়ে যায়। দেখে মনে হবে, লেখাটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। বলপেনের কালিতে অন্য উপাদান থাকে। সেটা অগ্‌জালিক অ্যাসিডের সঙ্গে 'রিঅ্যাক্ট' নাও করতে পারে। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় সস্তা বলপেনের কালিতে সেই উপাদান থাকে। তোমরা পরীক্ষা করে নিও। যদি সেই বলপেনের কালির সঙ্গে অগ্‌জালিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করে লেখা ভ্যানিশ করে দেয় তো ভাল কথা। ঐ পেন দিয়েও লিখতে বলতে পার।

ম্যাজিকের মধ্যে কৌশলটা হচ্ছে, ক্রিকেটের ব্যাটের মত। হাতে থাকলেই হল না, তাকে চালনা করতে হবে, সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ সঠিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই তো প্রকাশ পাবে তুমি কত বড় খেলোয়াড় বা কত বড় শিল্পী। কয়েক বছর আগে এই ছোট্ট খেলাটা দেখিয়েই আমার এক বন্ধু জাদুকর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ভি ভি গিরিকে চমকে দিয়েছিল। সে এক মজার কাহিনী।

ডাক্তারবাবুর ম্যাজিক

ডাঃ নীরূপ মিত্র হচ্ছেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। খুব ভাল ডাক্তার। বেশ হাত যশ। রোগ নাকি ওঁকে দেখে ছুটে পালায়। যাই হোক, একদিন আমার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং সেই ডাক্তারবাবু এসেছিলেন আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে। পৃথিবীতে আর যাই হোক না কেন, ইঞ্জেকশন জিনিসটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। বিশ্রী ব্যাপার। ইথারের গন্ধটাও আমার পছন্দ নয়। কেমন যেন দুঃখ মাখা, কান্না পাওয়া, ভয় দেখানো গন্ধ। ঐ গন্ধ মানেই 'ট্রাজেডি'র শুরু। পটাস করে সূঁচ ফুটিয়ে দেয়া।

সেদিন বাঁচার তাগিতে ইঞ্জেকশন হাতে ডাক্তার মিত্রকে ম্যাজিক দেখাতে হয়েছিল। কথা নেই বার্তা নেই, কি একটা ওষুধ নিয়ে সিরিঞ্জ উঁচিয়ে আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে আসেন। ভদ্রলোকের সব ভাল, কিন্তু এটুকুই খারাপ। আমি হাউমাউ করে উঠি। কিন্তু তিনি সদর্পে যেন বর্শা উঁচিয়ে ধেয়ে আসেন, আমি বলি, "দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, কটা ইঞ্জেকশন দেবেন আমাকে, এই তো একটু আগে আর একজন ডাক্তারবাবু এসে কি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলেন। "শুনতেই ভদ্রলোক কেমন চুপসে গেলেন। বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, "কি ইঞ্জেকশন দিয়েছেন, কে দিয়েছেন?" আমি বুঝি, আমার কথা জায়গামতোই পৌঁছেছে। বলি, "আমার খুড়তুতো ভাই ডাঃ সোমনাথ সরকারও আমার শরীর খারাপ শুনেই ছুটে এল। তারপর কি এক ইঞ্জেকশন দিয়ে এই একটু আগে চলে গেল। ওষুধের নামটাম আমি জানি না··· ও তো আপনাদের ব্যাপার··· আর প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেও হাতের লেখা এমন তালগোপাল পাকানো, গোয়েন্দা লাগিয়েও বোঝা মুশকিল···। " ডাঃ মিত্র তাঁর ইঞ্জেকশন অস্ত্র নামিয়ে রাখেন। বলেন, "আমার আগে আপনি আপনার ডাক্তার ভাইকে এনেছিলেন, তিনি আপনাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে গিয়েছেন, তবে আমার জন্য আর কি বাকি রইল?" আমি বললাম, "কেন, ট্যাবলেট, মিকচার, ক্যাপসুল, টনিক···এসব আপনার জন্য রাখা আছে। আগের ডাক্তারবাবু এসবের কিছু

দেননি। আপনি দিন। ” ভদ্রলোক হেসে ফেলেন। বুঝতে পারেন, আমি ইঞ্জেকশন ভয় পাই। এড়িয়ে যেতে চাইছি। বললেন, “ঠিক আছে, ইঞ্জেকশন দেব না। তবে একটা ম্যাজিক দেখাতে হবে।” চমৎকার! এই না হলে ডাক্তার! ক'টা ম্যাজিক দেখবেন বলুন, অনেক, অনেক দেখাব–শুধু প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমাকে কখনও ইঞ্জেকশনের খোঁচা দেবেন না। ” আমি তাঁকে বলি, “একটা কাগজে আমার ওষুধের নাম লিখে একটা খামের মধ্যে ভরে মুখ বন্ধ করে দিন। আমি ম্যাজিক করে জেনে নেব আপনি কি লিখেছেন। ” ভদ্রলোকও ভারি মজার। বললেন, “ঠিক আছে, আমি লিখছি। খাম সিলও করে দিচ্ছি, আপনাকে সত্যি সত্যি সিল না খুলে বলতে হবে, কি ওষুধ দিয়েছি। ” ডাক্তারবাবু ওষুধের নাম লিখে খামটা সিল করে আমাকে দিলেন, আমি খামটা নিয়ে ওপাশ ফিরে একটা কিছু করলাম। আর তারপর খামে ফুঁ দিতে দিতে ডাক্তারবাবুকে সেটা ফেরত দিলাম। আর তারপর তাঁকে চমকে দিয়ে বলে দিলাম, কি লেখা আছে ভেতরে। ডাক্তারবাবু হতভম্ব! খামটা তখনও সিল করা আছে। কোথাও কোনও কাটাছেঁড়া নেই, তা হলে আমি জানলাম কিভাবে? কৌশলটা তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন দিতে এসে প্রথমেই তুলোয় ইথার লাগিয়ে আমার হাতে ঘষতে এসেছিলেন। ইঞ্জেকশন দেয়া হয়নি বলে সেই ইথার মাখা তুলো আর কাজে লাগেনি। আমি সেটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তারবাবু খামটা সিল করে আমাকে দিলে ঐ খামের ওপর আমি সেই তুলো-ইথার ঘষে দিই। তাতে কিছুক্ষণের জন্য খামটা স্বচ্ছ 'ট্রান্সলুসেন্ট' হয়ে যায়···ভেতরের লেখা দেখা যায়। কিছুটা পড়তে পারলেই হলো, মানুষকে তা চমকাবার পক্ষে যথেষ্ট। ইথার আবার চটপট উড়ে যায়। ফুঁ দিলে তাড়াতাড়ি উড়ে যাবে। আমি ফুঁ দিয়ে সব উড়িয়ে খামটা আবার আগের মত করে ফেরত দিই।

এ লেখার খবর ডাক্তারবাবুর কানে যাবেই। অর্থাৎ কৌশলটা উনিও জেনে যাবেন। পরের বার এ কৌশলে আর ওঁকে ঠকানো যাবে না। ঠিক আছে, তখন আবার অন্য একটা কিছু ভেবে নেয়া যাবে।

কালো! তা সে যতই কালো হোক

সেই সোনার ডিমের গল্প তোমরা শুনেছ। একটা হাঁস নাকি রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়ত। সেই হাঁসের মালিক বেশি ডিম তাড়াতাড়ি পাওয়ার লোভে হাঁসের পেটটা কেটে ফেলে। সোনার ডিম সে ভেতরে তো পেলই না, বরং হাঁসটা মারা যায়।

"সোনার ডিম হয় কি না জানি না, তবে রুপোর ডিমের কথা আমি জানি। একটা কালো হাঁস রুপোর ডিম পাড়ে। আমার কাছে একটা আছে। " জাদুকর একটা কাচের গ্লাস নিয়ে এলেন, তলায় কয়েকটা ডিম রাখা আছে। সব কটাই সাদা, কিন্তু মাত্র একটা ডিম উজ্জ্বল চকচকে রূপালি।

দর্শকরা দেখলেন এবং অনেকেই মন্তব্য করলেন, "ওটা রূপালি রং করা ডিম"।

জাদুকর তখন বললেন, "এটাই তো সমস্যা। ডিমের প্রতি লোভ, অবহেলা করলে বা মন কালো করলে ও আবার কালো হয়ে যায়, সেজন্য আপনাদের; হাতে দিয়ে দেখাতে পারছি না। "

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "তার মানে? কালো হয়ে যাবে মানে?

জাদুকর তখন তাঁকে বললেন, "ঠিক আছে, দেখুন, হাতে নিয়ে দেখুন, ওটা কালো তো হবেই, আপনাকেও কালো করে দেবে। "

জল ফেলে ডিমটা বের করা হল। আরে, কোথায় গেল সেই রূপালি ডিম! এ যে কুচকুচে কালো, কালিমাখা। দর্শকের হাতেও কালি লেগেছে।

খুবই সহজ ম্যাজিক এটা। ডিমটা মোটেই রুপোর নয়, সাধারণ। তবে এর গায়ে আগে থেকে কেরোসিন ল্যাম্প বা প্রদীপ জ্বেলে ভুসো কালি জমানো ছিল, বড় চিমটে দিয়ে ডিমটাকে ভুসো কালিতে ধরলে চারদিকে লাগানো সম্ভব হবে। এ ভুসো কালি জমানো ডিম জলে ডুবিয়ে রাখলে চকচকে রূপালি মনে হবে। আসলে ওটা রূপালি রং নয়···ভুসো কালির ফাঁকে ফাঁকে হাওয়া আটকে আছে, সে হাওয়াটা আয়নার কাজ করে বাইরের আলোকে বিচ্ছুরিত করে। দেখলে মনে হয়, উজ্জ্বল চকচকে গলানো রুপো দিয়ে তৈরি ডিম। জল ফেলে দিলে ডিম আবার কালো চেহারার রূপ নেয়। হাতে ধরলে কালি তো লাগবেই।

আবার থটরিডিং

জাদুকরের হাতে পাঁচটা কার্ড, তাতে সাতটা বিভিন্ন সংখ্যা সাজিয়ে লেখা আছে। জাদুকর দর্শকদের একজন কাউকে ডেকে বললেন, "আপনি এক থেকে চৌদ্দর মধ্যে যে কোনও একটা সংখ্যা ভাবুন, এবং সে সংখ্যাটা এই কার্ড পাঁচটার মধ্যে যেখানে যেখানে আছে সেগুলো আপনার হাতে রেখে দিন।" দর্শক একটা সংখ্যা ভাবলেন। এবার জাদুকর একটা কার্ড তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এতে আছে সংখ্যাটা?" দর্শক যদি 'হ্যাঁ' বলেন সেই কার্ডটা তাঁকে দিয়ে দিলেন জাদুকর, আর যদি 'না' বলেন তাহলে সেটা বাদ দেয়া হল। যাই হোক, এভাবে যে যে কার্ডে তাঁর মনোনীত সংখ্যাটা আছে, সেগুলো তাঁর হাতে রইল। এবার জাদুকর দর্শকের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করলেন, এবং তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে দিলেন, দর্শক কোন্ সংখ্যা ভেবেছিলেন।

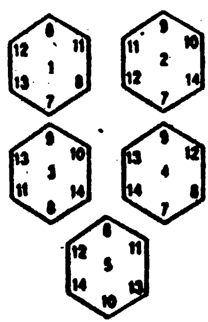

এ কৌশলটাও খুব সহজ। এত সহজ যে, তোমার এখনই করে দেখাতে ইচ্ছে করবে। ঐ কার্ডগুলোতে যে নম্বরগুলো লেখা ছিল, তার ঠিক

াঝখানে যে নম্বরটা লেখা আছে সেটাই তোমার ম্যাজিকের গোপন চাবি। য যে কার্ডে দর্শকের পছন্দমতো সংখ্যাটা (এক থেকে চৌদ্দর ভেতরে) মাছে, সে কার্ডগুলো তো দর্শকের হাতে রইল। কিন্তু যে কার্ডগুলোয় সেই াম্বরটা নেই সেগুলো বাতিল বললেও ওগুলো কিন্তু মোটেই বাতিল নয়। ওগুলোই তোমার কাছে আসল, ঐ কার্ডগুলোর মাঝের সংখ্যাগুলো মনে ানে যোগ করে ফেলো চটপট এবং সে যোগফলকে পনের থেকে বাদ দাও। বিয়োগফল যা হল, সেটাই দর্শকের মনোনীত সংখ্যা। কার্ড পাঁচটার ছবি দয়া হলো। করে দ্যাখো, নিজেই চমকে যাবে।

পয়সা থেকে ছাই

এবার যে ম্যাজিকটা শেখাব, সেটা একটা কেমিক্যাল ম্যাজিক। খুব সহজ, কিন্তু ঠিকমতো দেখাতে পারলে অনেকেই তাজ্জব বনে যাবেন। জাদুকর বললেন, ম্যাজিকের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এবং সেগুলো অভ্যাস করতে করতে তিনি নাকি অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষের যে-কোন 'শক্তি'কে একটা কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে পারেন। এবং এনে পার্থিব কোনও বস্তুকে জড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। তাঁর এ 'ক্ষমতা' নাকি আরও একজনের আছে। তবে তিনি কিন্তু স্টেজে ম্যাজিক দেখান না, তাঁর নিজস্ব আশ্রমে এবং ভক্তের বাড়িতেই শুধু করেন। তাঁর নিজের নামে তাঁকে কেউ চেনে না। তবে 'দুচ্ছাই বাবা' নামে তিনি বেশ পরিচিত।

তা যাই হোক, তিনি দর্শকদের কারও কাছ থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ১০ পয়সার 'কয়েন' চেয়ে নিলেন। তারপর সেটা রুমাল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "এতে ভাল মন্দ বহু মানুষের স্পর্শ লেগে আছে। সেগুলো মুছে ফেলা যাক।" পয়সাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তিনি সেটা নিয়ে দর্শকের একজনের হাতে দিয়ে বললেন, "আপনার গায়ের জোর খাটিয়ে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে রাখুন এই পয়সাটা···দেখবেন কেউ যেন নিতে না পারে বা বাইরের হাওয়া যেন স্পর্শ করতে না পারে।" ভদ্রলোক তো পয়সা বেশ শক্ত করে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখলেন। এবার জাদুকর বললেন, "আমি আপনার শরীর থেকে কিছু শক্তি ঘনীভূত করে ঐ কয়েনে নিয়ে আসছি। সাবধানে থাকুন।"

অবাক ব্যাপার! দর্শক ভদ্রলোক কেমন যেন অস্থির বোধ করতে লাগলেন। কারণ তাঁর হাতের মুঠোর ভেতরে পয়সা তখন অদ্ভুতভাবে তেতে উঠেছে। একটু পরে বেশ গরম হয়ে উঠল। তার একটু পরে তিনি আর পয়সাটা হাতে ধরে রাখতে পারলেন না, মুঠো থেকে বের করে এনে টেবিলে রাখলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত কান্ড! তাঁর হাতে কোত্থেকে যেন সাদা ছাই এসে গিয়েছে। টেবিলের ওপর পয়সাটাতেও যেন কি একটা ভর করেছে। দর্শক ভদ্রলোকের চারদিকে অদ্ভুতভাবে ছাই ছড়িয়ে পড়ছে। সকলে অবাক! সাদা-সরল আর নরম মনের দর্শকরা তো ঢিপ ঢিপ প্রণামও শুরু করে দিতে পারেন। দৈবশক্তি না কিছু, পুরোটাই কেমিক্যাল কারসাজি, ল্যাবরেটরি থেকে কিছুটা 'মারকিউরাস ক্লোরাইড'-এর দানা সংগ্রহ করে রুমালের এক কোণে লুকিয়ে রাখ, পয়সা পরিষ্কার করার অছিলায় সেই মারকিউরাস ক্লোরাইড পয়সার এপাশ থেকে ওপাশে ঘসে দাও। ব্যস্, এই হল কারসাজি, মারকিউরাস ক্লোরাইড ঐ পয়সাটার অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ছাইয়ের মত পদার্থ সৃষ্টি করবে। দেখে মনে হবে অলৌকিক ঘটনা কিছু। ম্যাজিকটা মজার, কিন্তু খবরদার এটা দেখিয়ে তুমি সাধু সাজবার চেষ্টা করো না। একটা কথা, হাত ভালভাবে ধুয়ে নিয়ো। এ জাতীয় কেমিক্যালস শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

ভুলের হিপনোটিজম

আমাদের ক্লাসে পানু নামে একটা ছেলে ছিল। ও ছিল মুখস্থ করার ওস্তাদ। কবিতা-টবিতা তো বটেই, ইতিহাস, ভূগোল সবকিছুর পর অঙ্ক এবং ডিকশনারিও নাকি সে মুখস্থ করতে চেয়েছিল। ওকে নিয়ে আমরা আতঙ্কে থাকতাম। বুঝুক না বুঝুক, ও গড়গড় করে সব বলে দিতে পারত। ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট বেশ ভাল করত। তবে হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে যে একটু এদিক ওদিক হত না তা নয়, মুখস্থ সাম্রাজ্যের সঙ্গে 'কমন' না এলেই বাধত গোলমাল। তখন সব ভুলভাল হয়ে যেত। ওর 'অ্যাটিচুড' আমার ভাল লাগত না। সবসময়ে একটা পন্ডিত-পন্ডিত ভাব। একদিন আমি বলি, "জানো আমি হিপনোটাইজ করে সব বিদ্যাকে গুলিয়ে দিতে পারি। তুমি যা-যা মুখস্থ করবে, তা তালগোল পাকিয়ে পেটে ঢেলা হয়ে যাবে! " সে তখনও বিজ্ঞের মত হাবভাব করে বলে, "অসম্ভব! " ক্লাসের বাকি বন্ধুরা সকলে আমাকে সমর্থন করতে থাকে। ফলে শুরু হয় হইচই। কথাটা স্যার-এর কানে গিয়ে ওঠে। স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "কি প্রদীপ, তুমি নাকি তোমার ম্যাজিকের ক্ষমতা দিয়ে লেখাপড়াকে তালগোল পাকিয়ে দিতে পার?" আমি কথা বাড়াই না। বলি, "একটা ছোট্ট প্রমাণ দেব স্যার। পানু তো খুব বিদ্যাদিগ্‌গজ, দেখবেন ও কেমন এলোমেলো জবাব দেবে! "

আমি একটা কাগজের মধ্যে দুটো সহজ সংখ্যা লিখে পানুকে বলি মুখে মুখে এ দুটো সংখ্যা যোগ কর এবং যোগফলটা খাতার পেছনে লিখে রাখ।

খুব সাবধানে করো, কিন্তু দেখবে তোমার ভুল হবেই। ও যখন মনে মনে যোগ করছে আর লিখছে, আমি তখন একটা পেন্সিল নিয়ে ওর মাথার ওপর ঘুরিয়ে বললাম, "ছি-ছু-ছাঃ—সব গুলিয়ে যাঃ।" পানু বিরক্তভাবে যোগ করল। দুবার 'চেক' করে নিল।

এবার আমি স্যারের কাছে ঐ সংখ্যা দুটো নিয়ে বলি, আপনি স্যার এ সংখ্যা দুটো যোগ করে পানুকে জিজ্ঞেস করুন ও উত্তর কি বলে। অবাক কান্ড। পানুর উত্তর ভুল হয়েছে!

এক্সপেরিমেন্টটা পাকা করার জন্য আবার দুটো সংখ্যা দেয়া হল পানুকে। স্যারকেও দেয়া হল যোগ করতে। অবাক ব্যাপার! একই সংখ্যা, সবকিছুই এক। কিন্তু পানুর উত্তর এবারও ভুল! মাথা চুলকোতে থাকে সে। ভীষণ সহজ এ ম্যাজিকটা। তবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খুব সপ্রতিভভাবে দেখাতে হবে। একটুও জড়তা দেখালে বা আমতা আমতা করলে চলবে না। পানুর অঙ্ক আর স্যারের অঙ্ক একই ছিল, তবে তাতে একটা চমৎকার কারসাজি ছিল। অঙ্কটা যে কোনও অঙ্ক নয়। একেবারে ম্যাজিকের অঙ্ক।

একটা সাদা কাগজের টুকরো নাও। তাতে এ সংখ্যা দুটো লেখ।

681

806

এবার যাকে জব্দ করতে চাইছ তাকে এটা দিয়ে বলো, মনে মনে যোগ করে তার খাতায় লিখে রাখতে। সে যোগ করে দেখল যোগফল 1487।

এবার সংখ্যা দুটো নিয়ে স্যারের কাছে দেয়ার সময় কাগজটা ঘুরিয়ে ধর। খেয়াল করে দেখ, কাগজটা ঘোরানো। ঐ একই সংখ্যা দুটো দাঁড়াচ্ছে।

908

189

এবার তাঁকে যোগ করতে বললে এর যোগফল তিনি পাবেন 1097। স্বাভাবিকভাবেই একই অঙ্কের দু'রকম উত্তর দেখে ছাত্রের ভুল হয়েছে বলা হবে। কাগজটা ঘুরিয়ে দেয়ার ফলে অঙ্কটাই যে পাল্টে গেছে তা তো আর কেউ জানবেন না। যাই হোক, অভ্যাস করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেখিয়ো। সকলেই যেন ভাবে, সত্যি সত্যিই তুমি গুলিয়ে দিচ্ছ। 1, 0, 8, 9 এই নম্বরগুলোও ভালভাবে, সযত্নে লিখতে হবে। যেন নম্বর উল্টে গেছে, তা বুঝতে না পারা যায়। 9 উল্টে যেন পরিষ্কার 6 হয়।

জন্মদিনের ম্যাজিক

তোমার বন্ধুর জন্মদিন কবে, তা জানায় অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। তারিখটা তো সে নিজে থেকেই সকলকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সপ্তাহের কোন্ 'বার'-এ তার জন্ম, তা সাধারণত অনেকেরই জানা থাকে না। আজ তোমাদের একটা ম্যাজিক হিসেব শিখিয়ে দিচ্ছি, যা দিয়ে তুমি সেই সঠিক 'বার'টা বলে দিতে পারবে।

এজন্য কিন্তু পুরনো ক্যালেন্ডার বা পাঁজিপুঁথির দরকার নেই। সামান্য একটা চার্ট বা হিসেব, সেটা জেনে রাখাই এর গোপন কৌশল। হিসেবটা মুখে মুখে বা মনে মনে করতে এবং চার্টটাকেও মুখস্থ করে রাখলে বন্ধুদের আরও চমকে দিতে পারবে। তারা ভাববে, তোমার মাথায় একটা কম্পিউটার বসানো আছে। যাই হোক, কৌশলটা বা হিসেবটা শিখিয়ে দিচ্ছি। ধরা যাক, যাঁর জন্মবার বের করতে হবে তাঁর জন্ম তারিখ হল 31 জুলাই, 1946, অর্থাৎ তারিখ হল 31-7-1946। জন্মবছরের (বা খ্রিস্টাব্দের) সেই সংখ্যা দুটো লেখা। এক্ষেত্রে তা হল 46। একে চার দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল লেখ। যদি ভাগশেষে কিছু বাকি থাকে, সেটা বাদ দাও। এক্ষেত্রে 46 কে 4 দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল 11 হচ্ছে। ভাগশেষ থাকছে 2, এবং সেটা বাদ দিলাম। জন্মবছরের সঙ্গে এ ভাগফলটা যোগ কর। এক্ষেত্রে সেটা হল 46+11= 57। এবার যে মাসে তাঁর জন্ম, সে মাসের কোড নম্বরটা এই সংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জুলাই মাসে তার জন্ম। চার্টে দেখা যাচ্ছে জুলাই-এর কোড নম্বর হচ্ছে 7 সুতরাং যোগফল একই রইল। এবার এই যোগফলের সঙ্গে জন্ম তারিখটা যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে তা হল 57+31= 88। এ যোগফলকে 7 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল কত হল জানার দরকার নেই, ভাগশেষটাই আসল। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 88-কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকছে 4.

এবার দ্বিতীয় চার্টে এই ভাগশেষ সংখ্যাটা কোন বারকে বুঝাচ্ছে, সেট দেখে নাও। এক্ষেত্রে '4' ভাগশেষ আছে, সুতরাং চার্ট অনুযায়ী '4' অর্থাৎ বুধবার হচ্ছে তাঁর জন্মবার।

প্রথম চার্ট

মাসের কোড				
জানুয়ারি	...	হচ্ছে	...	1
ফেব্রুয়ারি	...	হচ্ছে	...	4
মার্চ	...	হচ্ছে	...	4
এপ্রিল	...	হচ্ছে	...	0
মে	...	হচ্ছে	...	2
জুন	...	হচ্ছে	...	5
জুলাই	...	হচ্ছে	...	0
আগস্ট	...	হচ্ছে	...	3
সেপ্টেম্বর	...	হচ্ছে	...	6
অক্টোবর	...	হচ্ছে	...	1
নভেম্বর	...	হচ্ছে	...	4
ডিসেম্বর	...	হচ্ছে	...	6

দ্বিতীয় চার্ট

সপ্তাহের কোড		
শনিবার	...	0
রবিবার	...	1
সোমবার	...	2
মঙ্গলবার	...	3
বুধবার	...	4
বৃহস্পতিবার	...	5
শুক্রবার	...	6

খোপের ম্যাজিক

জাদুকরের কাছে একটা 10 সেন্টিমিটার বাই 10 সেন্টিমিটার চৌকো কার্ড আছে। তাতে গ্রাফ পেপারের মত ছক কাটা আছে। চওড়ায় দশটা খোপ আর লম্বাতেও দশটা খোপ। অর্থাৎ প্রতিটি খোপ হল এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং হিসেবমত ওখানে মোট 100টা ওরকম খোপ আছে। ঐ খোপগুলোতে আবার নানারকম পাঁচমিশেলি নম্বর এলোমেলোভাবে লেখা আছে। এবার জাদুকর একটা দুই সেন্টিমিটার বাই দুই সেন্টিমিটার কাগজের টুকরো নিয়ে দর্শকদের একজনকে বললেন, যে কোনও চারটে খোপকে ঐ কাগজের টুকরো গিয়ে চাপা দিতে। দর্শক তাঁর ইচ্ছেমত চারটে পাশাপাশি খোপকে ঐ কাগজ দিয়ে চাপা দিলেন। কি-কি নম্বর চাপা পড়ল তা কিন্তু জাদুকর জানেন না। চাপা দেয়ার পর তিনি মুখ ফেরালেন, এবং চট করে বলে দিলেন, ঐ চাপা দেয়া সংখ্যাগুলোর যোগফল কত। সকলেই অবাক!

নম্বরগুলো এলোমেলো পাঁচমিশেলি বলে মনে হলেও, তা কিন্তু নয়। খুব সযত্নে, হিসেব করে ওগুলো সাজানো আছে। দেখে এলোমেলো মনে হলেও আসলে তাতে একটা 'সিস্টেম' বা নিয়ম আছে। সিস্টেমটা জানার দরকার নেই, তোমরা পরের পাতার চার্টটা দেখে কপি করে নাও। সাবধানে করবে, যেন ভুল না হয়। এবার চৌকো ছোট্ট কাগজটা নিয়ে যে কোনও চারটে পাশাপাশি নম্বর বা খোপকে চাপা দাও। ধরা যাক 19, 6, 12, 25. পাশাপাশি চারটে নম্বরকে চাপা দেয়া হয়েছে। ওটা চাপা দেয়া থাক। এ চাপা দেয়া চৌকোর চার কোণের যে কোনও একটা দিকে কোণাকুণিভাবে দুটো খোপ এগিয়ে যাও, যে সংখ্যাটা সেই খোপে পাবে সেটা 65 থেকে

বাদ দাও। উত্তর হিসেবে যা থাকবে তা হল ঐ দর্শকের পছন্দ করা প্রথম চারটে খোপের যোগফল। এক্ষেত্রে 19, 6, 12, 25 সংখ্যাগুলো চাপা দিয়ে যে স্কোয়ারটা পেয়েছি তার কোণাকুণি দুটো খোপ এগিয়ে গেলে পাচ্ছি 'তিন'। এ তিনকে 65 থেকে বাদ দিলেই পাব 62.

24	11	3	20	7	24	11	3	20	7
5	17	9	21	13	5	17	9	21	13
6	23	15	2	19	6	23	15	2	19
12	4	16	8	25	12	4	16	8	25
18	10	22	14	1	18	10	22	14	1
24	11	3	20	7	24	11	3	20	7
5	17	9	21	13	5	17	9	21	13
6	23	15	2	19	6	23	15	2	19
12	14	16	8	25	12	4	16	8	25
18	10	22	14	1	18	10	22	14	1

ওদিকে 19, 6, 12, এবং 25-এর যোগফল 62! কি, মজার নয় কি?

জাদুর বালি

এবার যে ম্যাজিকটা শেখাচ্ছি সেটা একটা 'ট্র্যাডিশনাল' ভারতীয় ম্যাজিক। আগেকার দিনের রাজা-মহারাজারা জাদুকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জাদুকরেরাও রাজাদের অনুগ্রহে নানারকম 'এক্সপেরিমেন্ট' চালাতেন। নতুন নতুন কৌশল সাজিয়ে দর্শকদের অবাক করে দিতেন তাঁরা। এক রাজার জাদুকরের সঙ্গে অন্য রাজার জাদুকরের প্রতিযোগিতা হত। রাজা এবং দেশের সম্মান তাঁর ওপর নির্ভর করত। যে জাদুকর যত অবাক-করা জিনিস দেখাতে পারতেন, তাঁর সম্মান অন্য দেশের জাদুকরদের চেয়ে বেশি হত। রাজা-মহারাজারাও উৎসাহ দিতেন জাদুকরদের 'সাধনা' বা 'গবেষণা'র কাজে।

কিন্তু রাজারাজড়াদের হাত থেকে রাজত্ব প্রতিপত্তি চলে যাওয়ার পর থেকে জাদুকরদের হল সবচেয়ে বড় বিপত্তি। ম্যাজিকের কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই ব্যয়বহুল কাজ। রাজারা যখন অপারগ হয়ে গেলেন, তখন জাদুকররা পড়লেন বিপাকে। জাদু দেখানোই তাঁদের প্রধান কাজ। বাধ্য হয়ে রাজ্যসভার আসর ছেড়ে, পথে-ঘাটে, মাঠে, মেলায় তাঁদের জায়গা করে নিতে হল। আমাদের দেশে মঞ্চে অভিনয় করে, টিকিট বিক্রি করে, ম্যাজিক দেখানোর চল তখন বিশেষ ছিল না। 'আর্ট' এবং 'কালচার' বলতে যা বুঝায়, তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন রাজা-মহারাজা এবং জমিদাররা। তার যখন আর রেওয়াজ নেই, তখন জাদুকরদের অবস্থা তো খুবই দুঃখের হবে। বাধ্য হয়ে তাঁরা গরিব হতে হতে, একেবারে পথের 'বেদে' হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজরা এসে এই বেদেদের কাছ থেকে অনেক কৌশল শিখে তাঁদের দেশে নিয়ে যান। তারপর বেমালুম নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত বলে চালিয়ে দিতেন। যাই হোক, এবার যে ম্যাজিকটা শেখাচ্ছি

সেটা মহিমায়, মাধুর্যে 'ক্ল্যাসিক্যাল' পর্যায়ে চলে গেছে। বেদেরা এখনও অনেকেই রাস্তার ধারে লোক জমিয়ে এ ম্যাজিক দেখান। আমিও দেখাই, দেশ-বিদেশের অনেক নামী-দামী জাদুকররাও দেখান। প্রদর্শন-নৈপুণ্যের জন্য সেগুলো আলাদা-আলাদা ম্যাজিক বলে মনে হলেও সকলেরই একই কৌশল। কিন্তু প্রদর্শন-ভঙ্গির গুণে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। সহজ-সরল খেলা। জাদুকরের কাছে একটা বড় বাড়িতে শুকনো বালি আছে। জাদুকর সে বালি থেকে দু'হাত দিয়ে কিছুটা তুলে নিয়ে অন্য একটা পাত্রে রাখা জলে তা ফেলে হাত দিয়ে গুলিয়ে দিলেন। জলে ভিজে বালি গুলে গেল। এবার জাদুকর তাঁর মনকে সংযত করে সেই জলে হাত ডুবিয়ে একমুঠো ভেজা বালি তুললেন। আর তারপর সে বালিকে হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। অবাক কান্ড! বালি মোটেই ভেজা নয় একেবারে খটখটে শুকনো এবং হাওয়ায় বেশ উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। ভাবছ এ কি করে সম্ভব! জলে-গোলানো বালি আবার অত চটপট শুকনো ঝুরঝুরে হবে কিভাবে? ভারী সহজ ম্যাজিক এটা। প্রস্তুতিও একটু লম্বা, তবে কাজটা বেশ সহজ। খুব মিহি দানার বালি কিলোখানের জোগাড় কর। পরিষ্কার বালি হওয়া চাই, তাতে যেন মাটি মিশে না থাকে। এবার এ বালি নিয়ে একটা বড় কড়াইয়ে ঢেলে কড়াই আঁচে গরম করতে হবে। আর শুধু তাই নয়, একটা খুন্তি দিয়ে সে বালিকে অনবরত ঘাঁটতে হবে— যাতে পুরো বালি খুব গরম হয়ে যায়। এবার কিছুটা মোম নিয়ে সেই উত্তপ্ত বালিতে ফেলে খুন্তি দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে। গরমে মোম গলে গিয়ে বালিতে মিশে যাবে, এবং নাড়াচাড়ার ফলে পুরো বালিতে লেগে যাবে, এবং বালিকে 'ওয়াটার-প্রুফ' করে দেবে। এভাবে মিনিট ১৫-২০ খুব ভালভাবে নাড়াচাড়ার পর পুরো বালিটা একটা বড় 'ট্রে'-এর মধ্যে ঢেলে রাখ এবং অন্য একটা ট্রে দিয়ে

চেপে 'টাইট' করে দাও। একটু পরে বালি ঠান্ডা হলে ওই চাপ আর দিতে হবে না। দেখবে বালি কেমন পুরোটা মিলে মোমের জন্য একটা শক্ত চেহারা নিয়েছে। এবারে ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে ঐ বালির বরফি তৈরি করে রাখতে হবে। একটু পরে আরও ঠান্ডা হলে ঐ বরফি বেশ শক্ত হয়ে যাবে। আগে থেকে এ বরফি তৈরি করে রাখাই হল এ ম্যাজিকের কৌশলের প্রস্তুতি।

শুকনো বালির বাটিতে এ বরফি আগে থেকে লুকিয়ে রাখা ছিল। জাদুকর আঁজলা করে বালি তোলার সময় ঐ বরফিটাও তুলে নেন। জলে ফেলেন। ঘেঁটে দেন। ঐ বরফির কিন্তু কোনও ক্ষতি হবে না। এবার ম্যাজিকটা দেখাবার সময় জলে হাত ডুবিয়ে ওই বরফিটা তুলে নাও। মুঠোয় তুলে একটু চাপ দিলেই ওই ডেলা বরফিটা ভেঙে ঝুরঝুর করে পড়বে। সকলে দেখবেন, জাদুকরের অদ্ভুত ক্ষমতায় ভেজা বালি শুকনো হয়ে মুঠো থেকে ঝরে পড়ছে।

অটোম্যাটিক ম্যাজিক

জাদুকর একটা 'অ্যাশট্রে' থেকে একটা পোড়া দেয়াশলাই কাঠি তুলে নিলেন এবং তার পোড়া দিকটা ঘষে বাঁ হাতের তালুতে একটা মোটা দাগ কাটলেন। বিদেশে এ দাগ নিয়ে নানারকম কুসংস্কার আছে। ওটা নাকি 'অপয়া দাগ'। যদি এ দাগ কারুর হাতে আপনাআপনি চলে আসে, তাহলে অনেকেই একে অশুভ ভেবে তুকতাকের আশ্রয় নেয়। মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে পুরোহিতদের কাছে আসেন প্রতিকারের আশায়। আমাদের কাছেও অনেকে আসেন— তবে আনন্দ পান না। আমি তো তুক-তাকে বিশ্বাস করি না। ও দিয়ে কিচ্ছু হয় না–শুধু শুধু মানুষের অন্ধকার জগতে এলোমেলো ভাবে পাক খাওয়ানো আর শরীর, সময় এবং অর্থ নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, জাদুকর তার হাতের তালুতে ঐ 'অশুভ' একটা দাগ কেটে বললেন, "জাদুবিদ্যার সাহায্যে এই অশুভ চিহ্ন কাটানো যায়।" অভিনয়টা গম্ভীরভাবে করতে হবে–তা না হলে সবাই হেসে ফেলবেন।

জাদুকর বললেন, "যদি হাতের উলটো দিকে মুঠোর পেছনে ঐ পোড়া কাঠি দিয়ে একটা 'কাটাকুটি চিহ্ন' অথবা 'ক্রশ' আঁকা যায় তাহলে ঐ অশুভ

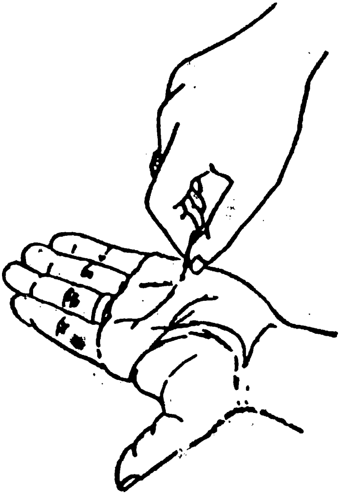

সংকেতেও কাটা পড়বে। জাদুকর ধীরে ধীরে তার মুঠোর পিঠে একটা 'ক্রশ' আঁকলেন···আর তারপর হাতটা মেলে ধরে আস্তে আস্তে ওল্টালেন, ও মা! কি অবাক কান্ড!! তালুর ঐ 'অশুভ' দাগটা একটা 'ক্রশ'-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে!!

এটা পরিষ্কার একটা 'অটোমেটিক ম্যাজিক'। জাদুকর যখন হাত উল্টে মুঠোর পিঠে দাগ দিচ্ছিলেন তখন হাতের তালুর মাস্‌লগুলোয়, মুঠোর চাপে, একদিকের কালি অন্যদিকে ছাপ পড়ে যাবে। কালো দাগটা হাতের তালুর একটা বিশেষ জায়গায় কাটতে হবে, ছবি দেখে সেই বিশেষ জায়গাটাকে চিনে নাও—তারপর নরম কালো দাগ দিয়ে জোরে মুঠো কর। নিজেই অবাক হয়ে যাবে—একটা লাইনই কেমন নিজের ছাপে আর একটা লাইন বানিয়ে 'কাটাকুটি' বা 'ক্রশ' চিহ্ন বানিয়ে ফেলছে।

এ ম্যাজিকটা যখন লিখছি তখন আমার বড় মেয়ে মানেকা এসে বলে, "এ ম্যাজিকটা আরও একভাবে করা যায়।" কেমন সেটা? ও বলে, "হাতের পাতায় নয়, কনুই-এর সামনের দিকে, যেখানে হাত ভাঁজ হচ্ছে, ঐ ভাঁজের সঙ্গে 45° কোণাকুণি পোড়া কাঠির দাগ দিলেও হাত ভাঁজ করার পর কাটাকুটি দাগ হয়ে যায়।"

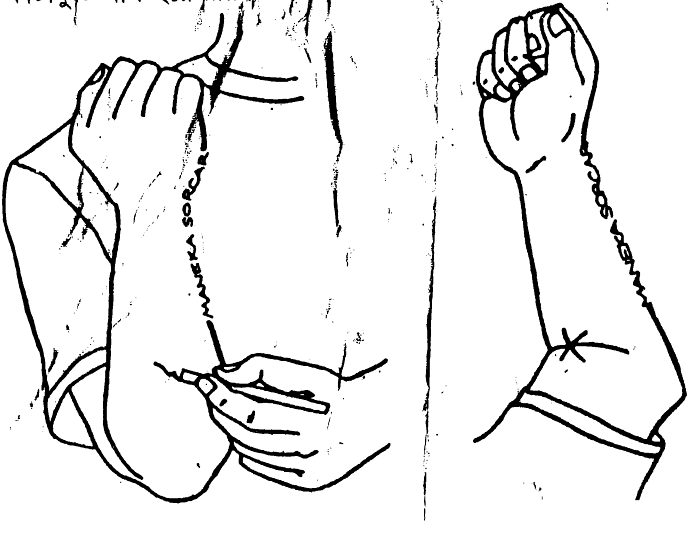

মানেকার ইচ্ছে, ওর পদ্ধতিটাও এখানে সংযোজিত হোক। ভাল কথা। তোমাদের জন্য ও ছবিও এঁকে দিয়েছে। আমার পদ্ধতিটার ছবি আমি এঁকেছি আর ওর পদ্ধতিটার জন্য ছবি ও এঁকেছে। কোথায় দাগ দিতে হবে এবং হাত কিভাবে ভাঁজ করে সামনের দিকে কাটাকুটি দাগ দিলে ঐ আগের দাগটাও কাটাকুটি দাগ হয়ে গেল বলে মনে হবে, সবই ছবির মাধ্যমে বুঝানো আছে। থ্যাঙ্ক ইউ মানেকা।

আজ এ পর্যন্ত থাক। পরে আরও মজার মজার নতুন ম্যাজিক তোমাদের শেখাবো।

সমাপ্ত